ভারত-নারী

প্রভাবতী দেবী

তালুকদার পাবলিশার্স
২৪এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ সাল

প্রকাশক :
প্রশান্ত তালুকদার
২৪এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ :
অরুণ বণিক

মুদ্রক :
রাজেন্দ্র নাথ দলপতি
শ্রী সারদা প্রেস
৪-এ, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা-৬

ভারতের নারী চিরদিনই যে পবিত্র আদর্শের জন্যে বিশ্বের সর্বত্র বন্দিতা তাহা হইল তাঁহার চিরন্তন মাতৃত্ব ও স্নেহশীল সেবা। ভারতের নারীর নিকট বিশ্ব তাহা শিক্ষা করিয়াছে।

—শ্রীঅরবিন্দ

ভারত-নারী

প্রভাবতী দেবী

নারী—আদ্যাশক্তি

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

প্রকৃতি যেমন ফুল-ফল-বৃক্ষ-জল জন্ম দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি তাকে সযত্নে আজও মাতৃস্নেহ দিয়ে পালন করে চলেছেন, নারীও তেমনি জন্মদিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করে দেননি। নারী তাঁর প্রেম স্নেহ-মমতা নারীত্ব দিয়ে বিশ্বমানবকে পালন করে চলেছেন।

আজও এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

যতদিন বিশ্ব থাকবে, ব্যতিক্রম হবেও না।

এই নারী জাতিকে যতো রকমে ব্যাখ্যা করাই যাক, মূল সিদ্ধান্ত শুধু এই, নারী বিশ্বপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি স্নেহময়ী বিশ্বজননী।

কিন্তু তবু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে এই নারী জাতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

পার্থক্য নারীত্বের না, পার্থক্য তার আচরণ, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। এবং ভারত-নারীদের থেকে বেশ কিছু স্বতন্ত্র।

ভারত-নারীদের বাল্যজীবন, বিবাহ-সংসার জীবন সবই পাশ্চাত্য নারীদের পরিপন্থি, একথা বলা বাহুল্য।

নারী দেবী

ভারতের আর্যঋষিগণ নারীকে দেবীরূপে পূজা করেছেন।

সে পূজা আজও আমাদের শেষ হয়ে যায় নি। ভারতের মানুষ আজও নারীকে দেবীরূপে পূজা করেন।

সীতা, সাবিত্রী, অহল্যা মানবী হয়েও এঁরা আজ আমাদের দেবী।

ভারতের শ্রীশ্রী৺কালী, শীতলা, চণ্ডী, মনসাকে মুনিঋষিগণ আদ্যাশক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। কালী, দুর্গাকে যে ভারতের মুনিঋষিগণ কত রকম ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার শেষ নেই। কখনো বিশ্ব-জননী, মহামায়া, আদ্যশক্তি, মহাদেবী, মহাশক্তি, অসুরবিনাশিনী ইত্যাদি রূপে। ভারতের জনগণ সে আদর্শ আজও ভোলে নি।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ

ভারতীয় নারীদের সঙ্গে পাশ্চাত্য ও অন্যান্য দেশের নারীদের আচরণ, ধর্মীয়ও সামাজিক প্রভেদ দেখা যায়। এটাই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ।

ভারতের মেয়েরা কুমারী অবস্থায় মা-বাবার কাছে মানুষ হয়। তারা যায় বাপ মার নির্বাচিত স্বামীর ঘরে। সেটাই হয় তাদের স্থায়ী সংসার।

কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরই নিজেরা স্বামী নির্বাচন করে। বিবাহ হয়।

ভারতের মেয়েরা বিধবা হলে, স্বামীর স্মৃতি পূজা করে ও সন্তানদের পিতা-মাতারূপে মানুষ করে। (অবশ্য আজকাল অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির স্পর্শে এর কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। সন্তানহীনা বিধবা নারীর আবার কেউ কেউ বিয়ে দেবারও চেষ্টা করেন। কিন্তু

তাও খুব অপ্রচলিত নিয়ম) শিক্ষিত করে সন্তানদের সমাজে পিতার ন্যায় মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এর পরিবর্তন দেখা যায় অন্যান্য দেশে। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা কয়েক বছর ঘর করার পর না বনলে স্বামী ত্যাগ করতে পারেন।

সে স্বামীর ঔরসে যে সন্তান হয়, কারো তত্ত্বাবধানে রেখে, অন্য স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে যান। পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে স্বামী ত্যাগ করতে পারেন। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে যে সন্তান হয়েছিল, তাদের পুনরায় কারো তত্ত্বাবধানে রেখে, আবার স্বামী নির্বাচন করেন এবং তাদের সঙ্গে ঘর করতে চলে যান।

আবার বিবাহিত মেয়েরা পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমও করেন। কিন্তু ভারতীয় মেয়েরা এসব গুণগুলো ঘৃণার চোখে দেখেন।

তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে, এর থেকে এই প্রমাণ হয়, পাশ্চাত্য দেশের নারীদের জীবন ভোগের জীবন।

ভারতীয় নারীদের জীবন ত্যাগ ও সেবার জীবন।

ভারতের নারীদের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারা যায় না।

যুগ যুগ ধরে ভারতের পুরাণে, নাটকে, কিংবদন্তীতে ভারতীয় নারীর উজ্জ্বল কাহিনী শুনে আসছি, তাতে আমরা ভারতবাসীরা গর্বিত না হয়ে পারি না। শ্রদ্ধা না করে পারি না।

বহুকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনীগুলো আমাদের কাছে আজ শুধু গল্প বলেই মনে হয়।

কিন্তু তবু সীতা সাবিত্রীর আদর্শ আজও আমাদের নারী-সমাজ বিস্মৃত হয়নি।

ভারতের নারী-সমাজ আজও তা অনুসরণ করে চলেছেন।

ভারতীয় নারীর আদর্শ সতী—যিনি পতির অপমান সহ্য করতে না পেরে, পিতার মুখে পতি-নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন।

সীতা—যিনি সর্বদা পতির সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছিলেন। ধরণীর মতো অশেষ দুঃখ-কষ্ট নতশিরে নীরবে সহ্য করে তবুও তিনি এক-মুহূর্তের জন্য স্বামী-চিন্তা থেকে বিরতা হন নি।

সাবিত্রী—যাঁর সাধনায় মৃত স্বামী পর্যন্ত সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন।

যে নারী স্বামী-প্রেমে ব্যাকুল হয়ে, মৃত স্বামীর কংকাল বক্ষে রেখে ভেলায় ভেসেছিলেন। সেই নারীরাই আমাদের ভারতের আদর্শ!

স্বামীর সুখ-দুঃখ, স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে বিলীন করা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ।

এ-আদর্শ কোনদিন শেষ হবার নয়, বিস্মৃত হবার নয়। এ-আদর্শ চির উজ্জ্বল। চিরদিন অনুকরণীয়।

ভারতের আদর্শ নারীর জীবনী

* * * * * * * * * * * * * *

"হে ভগবান্‌, তুমি চেয়েছ আমাদের বিশ্বাস কি ধরণের তা পরীক্ষা করতে তোমার কষ্টিপাথরে আমাদের আন্তরিকতা কষে দেখতে। ভগবান্‌, এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে আমরা যেন উঠে আসতে পারি উন্নততর, শুদ্ধতর হয়ে।"

শ্রীমা (পণ্ডিচেরী)

সতী

সতীত্বের পূর্ণ প্রতিমূর্তি সতী।

প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা।

মহাসুখে কৈলাসে কৃষ্ণ নাম জপ করেন।

কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে গেরুয়া বাস বসন।

পাগল ভোলা শ্মশান মশানে পাগলের মতন ঘুরে বেড়ান। ছাই-ভস্ম মেখে সদা ধ্যানে নিমগ্ন।

রাজ-কন্যা প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে, স্বামীর মতোই জীবন যাপন করেন।

কিন্তু তাও বাদ সাধলেন তাঁর পিতা দক্ষরাজ।

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়। সে যজ্ঞে সব দেবতাদেরই নিমন্ত্রণ হয়। সবাই উপস্থিত ছিলেন। এসব বড় বড় দেবতাদের মধ্যে অনেকেই দক্ষরাজের জামাতা।

যজ্ঞ স্থলে দক্ষরাজকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব জামাতাই সসম্ভ্রমে উঠে প্রণাম করলেন। প্রণাম করলেন না শুধু ভোলানাথ ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। তিনি আত্মভোলা লোক। সারা সময় হরিণাম মন্ত্র জপ করেন।

কিন্তু দক্ষরাজ ভোলানাথের তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে না পেরে তাঁকে অজস্র গালাগালি দিলেন। তবুও ভোলানাথের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ধ্যানমগ্নই ছিলেন।

দক্ষ এ অপমান ভুলতে পারলেন না।

এর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন, এ-যজ্ঞের নাম দক্ষ যজ্ঞ।

এ-যজ্ঞে তিনি সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করলেন কিন্তু প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে শুধু দেবাদিদেব শঙ্করকেই আমন্ত্রণ জানালেন না।

এ যজ্ঞানুষ্ঠানে সতীর অন্যান্য ভগ্নীরও নিমন্ত্রণ হল শুধু হলো না সতীর।

নারদের ওপর নিমন্ত্রণভার পড়েছিল। তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করে কৈলাসে গেলেন।

কৈলাসে সতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র, সতী তাঁকে সাদরে বসালেন। সতী নারদ ঋষিকে পেয়ে মহা খুশী। বললেন আপনাকে কৈলাসে দেখে আমি খুব আনন্দিত। আগে আপনি বিশ্রাম করুণ ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করুন।

নারদ সতীকে বললেন বিশ্রাম কি করব মা, মন কিছুদিন ধরেই বড় শ্রান্ত! মনে হয় না এর কোন প্রতিকার বা বিশ্রাম আছে!

সতী সেকি মুনিবর! আপনি সদা আনন্দময়। যাঁর সঙ্গীতে দেবতারা পর্যন্ত মুগ্ধ, সদানন্দিত, তাঁর আবার দুঃখ কিসের?

নারদ—হয় মা—হয়! তুমি কি পারবে এর প্রতিকার করতে?

সতী আমি সামান্যা নারী। আমি কি পারবো আপনার মনোদুঃখ দূর করতে। এতো দেবতা ছেড়ে, শেষে আমাকে—

নারদ পারবে মা, পারবে। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার এ মনোদুঃখ ঘুচাতে পারবে না। বলো মা—

সতী—মহর্ষি, কি আপনার মনোদুঃখ তাই তো এখনো জানলাম না।

নারদ—বেশ বলছি। খুব মন দিয়ে শুনবে মা—তোমার পিতা দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সে যজ্ঞে সমস্ত দেবতার নিমন্ত্রণ হয়েছে। এমনকি তোমার সমস্ত ভগ্নি-ভগ্নীপতির পর্যন্ত। কিন্তু কি বলব মা, তোমার এ হতভাগা সন্তানের বলতে পর্যন্ত কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে—তোমাদের নিমন্ত্রণ হয় নি।

সতী শিহরে উঠলেন। মনে মনে বললেন—পিতা যজ্ঞ করছেন। শঙ্করের নিমন্ত্রণ হয় নি! শিবহীন যজ্ঞ! এ কি করে সম্ভব!

পরে নারদকে বললেন—এ আপনি কি করে জানলেন ঋষি?

—জানি মা—আমি সব জানি। আমার ওপরই তো নিমন্ত্রণের ভার। এই তো আমি সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এলাম।

একটু থেমে নারদ আবার বললেন—মা, এ-অপমান আমার সহ্য হয় না। তাই যাবার পথে সব কথা তোমাকে বলে গেলাম।

—তা হয় না ঋষি। শিবহীন যজ্ঞ হয় না। এ-কথা বাবাকে আমার বোঝাতে হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাবা শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

ঋষি সানন্দে সতীর কাছ থেকে .বিদায় নিলেন, তিনি মনে মনে ভেবে নিলেন, শেষ পর্যন্ত এর কি পরিণতি হতে পারে!

দেবী এরপর এক মনে ভেবে নিলেন, এখন তাঁর কি কর্তব্য।

স্বামীর নিকট গেলেন, পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি নেবার জন্য।

শঙ্কর বুঝতে পারলেন পতিপ্রেমে পাগলিনীকে বাধা দিয়ে রাখা যাবে না।

সতীকে পিতৃগৃহে যাবার জন্য অনুমতি দিতে হবে।

সতী ভোলানাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন। দক্ষরাজের রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখলেন, নারদের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্য।

সেখানে তাঁর অন্যান্য বোনেরা এসেছেন। সবাই নিমন্ত্রিত। শুধু সতী ব্যতিক্রম।

সতীকে পেয়ে তাঁর মা খুব আনন্দিত। তিনি সতীকে অনেকদিন দেখেননি। তাই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে নানা সুখ-দুঃখের কথা বললেন।

সতীর অন্যান্য বোনেদের বড় বড় দেবতাদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। তারা খুব সম্পদশালী। তাঁদের দেহে নানারকম বেশভূষা। দারিদ্র্যের চিহ্ন এতটুকু নেই। শুধু সতীই নিরাভরণা। সবাই সেজন্য দুঃখ করতে লাগলেন।

বললে—সতীর মতো দুঃখী কেউ নেই।

কিন্তু এসব কথায় সতীর কিছুই মনোবেদনা হলো না, অনুতাপ হলো না। নিজেকে তিনি আরও গর্বিতা অনুভব করলেন।

সতী যজ্ঞসভায় গেলেন।

সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ ভয়ানক ক্রোধান্বিত হলেন। বিনা নিমন্ত্রণে আসার জন্য সতীকে ও তাঁর স্বামীকে অকথ্য তিরস্কার করলেন। সতী বাবাকে তিরস্কার থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন—আমি বিনা নিমন্ত্রণে এসেছি, আমাকে আপনি তিরস্কার করুন পিতা। কিন্তু আপনার জামাতা কিছু অপরাধ করেনি, তাঁকে আপনি কিছু বলবেন না।

দক্ষ—সে তোকে এ যজ্ঞসভাতে আসার অনুমতি দিলে কেন?

সতী—তিনি অনুমতি দিতে চাননি। আমি তাঁর কাছ থেকে জোর করে অনুমতি নিয়ে এসেছি। এতে তাঁর কোন দোষ নেই।

কিন্তু দক্ষ সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি সতীর সঙ্গে ভোলানাথেরও নাম জড়িত করে অজস্র অকথ্য ভাষায় ভোলানাথকে অপমান করতে লাগলেন।

সতী বিক্ষুব্ধ অন্তরে বললেন—পিতা, এ আপনি কি বলছেন! ভোলানাথ আমার স্বামী। নারীরা স্বামী-নিন্দা সইতে পারে না। আমার সম্মুখে আর আপনি আমার পতি-নিন্দা করবেন না।

কিন্তু সতী যতই পিতাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, দক্ষরাজ ততই শিবনিন্দায় উল্লসিত হয়ে পড়েন।

এবার সভার মধ্যে সতী নিজের সতীত্ব মহিমায় যোগাগ্নি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণের সামনে দেহত্যাগ করলেন।

সতীর মহিমা দেখে দক্ষ স্তম্ভিত বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

দেবতারা ধন্য ধন্য করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

মহাদেবের অনুচর নন্দী ভিগ্‌গীরই এ-খবর কৈলাসে পৌঁছে দিলেন।

মহাদেব নিজেও আত্মস্থ হয়ে সব জানতে পারলেন।

সতীর এ-অবস্থা জানতে পেরে তাঁর হৃদয় হাহাকার করে উঠল।

তিনি 'হা-সতী, হা-সতী' বলে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দিলেন। সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল। দেবতারা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

দেবাদিদেব মহাদেব এবার মস্তকের একগাছি জটা ছিন্ন করে মাটিতে ঘর্ষণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংহারমূর্তি বীরভদ্রের জন্ম হলো।

বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ ছুটে চললো দক্ষযজ্ঞের দিকে।

বীরভদ্র দক্ষরাজের মুণ্ড কর্তন করে যজ্ঞে নিক্ষেপ করলেন।

ভয়ে যজ্ঞস্থান থেকে সকলে পালাল।

এ-ভাবে সতী নিজের সতীত্ব রক্ষা করে জগতে আদর্শ নারী ও দেবী জগজ্জননী রূপে অমর হয়ে রয়েছেন। তাই আজও ভারতের ঘরে ঘরে সতীর পূজা।

সীতা

ওরে পাপিষ্ঠ—আমি যদি সতী হই, তবে সীতা হরণের পাপে তুই সবংশে নিহত হবি।

অভিশাপ শুনে রাবণের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ভীত ত্রস্ত পাপিষ্ঠ রাবণের মন সীতার অভিশাপ শুনে মুহূর্তের জন্য যেন বিবশ হয়ে পড়ল।

ভাবল, এ আমি কি করলাম! নারী হরণ করলাম! নারীর অভিশাপ কুড়ালাম।

কিন্তু পরক্ষণেই সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হোঃ-হোঃ করে হেসে ফেলল। সীতাকে আরও কঠিনভাবে বেষ্টন করে বললো—সামান্যা একজন ভিখারিণী—তার আবার অভিশাপ!

এবার সীতা অসহায়ার মত 'হা-রাম' 'হা-রাম' করে কেঁদে ফেলল। আবার ধিক্কার দিয়ে রাবণকে বললেন সীতা—ওরে পাপিষ্ঠ, এতো তোর দম্ভ! আজ যাকে ভিখারিণী বলে পরিহাস করছিস, অনতি-

বিলম্বে দেখবি, তাঁর কথাই সত্যে পরিণত হয়েছে। আবার আমি বলছি, আমি যদি শ্রীরাম-ঘরণী হই, সতী হই, এ নারী-হরণের পাপে তোকে সবংশে নিহত হতে হবেই।

কথাগুলো বলেছিলেন জনক-নন্দিনী সীতা।

শ্রীরাম-ঘরণী।

★ ★ ★

সীতা মিথিলার রাজা জনক রাজার কন্যা।

জনক রাজা জমি চাষ করতে গিয়ে লাঙ্গলের ফলায় অতি সুন্দরী রূপলাবণ্যবতী এক শিশুকন্যা পান।

সেজন্য তাঁর নাম দেন সীতা।

সীতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ চাঁদের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

জনক রাজা কন্যাকে নানা বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে দক্ষ করে তুললেন। তখন সীতা বালিকামাত্র।

কিন্তু তাঁকে শুধু শিক্ষা দিলে কি হবে, উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণও করতে হবে।

রাজা ঘোষণা করলেন, সাধনা করে তিনি যে হরধনু পেয়েছিলেন সেই হরধনু যে ভঙ্গ করতে পারবেন, তাঁর সঙ্গেই তিনি রাজকন্যার বিয়ে দেবেন।

দেশে বিদেশে এখবর রটে গেল।

বহু রাজা, রাজকুমার, সেনাপতি, বড় বড় বীর পর্যন্ত হরধনুতে-জ্যা রচনা করার জন্য এগিয়ে এলেন।

কিন্তু সবাই বিফল হলেন।

সবাই ব্যর্থ হয়ে, অপমানে লজ্জায় পালিয়ে গেলেন।

তখন এলেন লঙ্কার রাজা রাবণ।

রাবণ মহা শক্তিশালী।

অনেক বড় বড় দেবতাদের রাবণ লঙ্কায় বন্দী করে রেখেছিলেন।

সেজন্য তাঁর গর্বের সীমা ছিল না।

যখন শুনলেন জনক রাজা তাঁর সুন্দরী কন্যার জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন ও তাঁর দেবপ্রদত্ত হরধনু ভাঙ্গতে পারলে তাঁকেই কন্যা সমর্পণ করবেন, তখন আর তাঁর আনন্দের সীমা রইল না।

তিনি আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করলেন মিথিলায়।

পথে যেতে যেতে ভাবলেন, বাঁ হাতেই তিনি ধনু ভাঙ্গবেন। এতো যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, এতো দেবতাদের বন্দী করে রেখেছেন! সুতরাং— এ ধনু ভাঙ্গতে বাঁ হাতই যথেষ্ট।

কিন্তু এ কি ভাগ্যের পরিহাস!

হরধনু ভাঙ্গা তো দূরের কথা, তিনি তা চাগাতেই পারলেন না। ডান হাত, বাঁ হাত, দশ হাত—কোন হাতেই তাঁর চেষ্টা সফল হলো না।

লজ্জায় লঙ্কেশ্বর পালিয়ে এলেন।

এর পর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

তখন অসুররা ভয়ানক শক্তিশালী ছিল।

দেবতাদের যাগ-যজ্ঞ নষ্ট করে দিতো। রাক্ষসদের উৎপাতে কিছুতেই দেবতা বা ঋষিরা শান্তিতে থাকতে পারতেন না বা সাধনা করতে পারতেন না।

এ সময়ে অযোধ্যার রাজা দশরথের চারজন নাবালক সন্তান ছিলেন। তাঁরা সর্বশাস্ত্র ও সর্বঅস্ত্র বিশারদ।

জনক রাজার রাজপুরোহিত বিশ্বামিত্র এ-সব অসুরদের দমন করার জন্য তাঁর দু' পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করলেন।

শেষে ঋষি রাম ও লক্ষ্মণকে দিয়ে রাক্ষসদের দমন করে হরধনু ভাঙ্গবার জন্য জনক রাজার রাজসভায় নিয়ে এলেন।

বড় বড় রাজা মহারাজা ও সেনাপতিরা বালকের নাম শুনে হেসে উঠলেন। এত বড় বড় বীর এলো গেলো, এই সামান্য বালক হরধনু ভাঙ্গবে!

কিন্তু জনক রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র সকলের পরিহাসকে

ভ্রূকুটি করে অনায়াসে হরধনু উত্তোলন করলেন। শুধু উত্তোলন করলেন না, জ্যা রচনা করে ধনু ভেঙেও ফেললেন।

দেখে সব বীরই লজ্জায় পালিয়ে গেল।

অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হলো।

দেবতারা রামের বীরত্ব দেখে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। আকাশে বাতাসে 'জয় রাম' 'জয় রাম' ধ্বনি উঠল।

সীতা রামচন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

এ রামচন্দ্রেরই পত্নী সীতা।

যিনি ভারতীয় নারীসমাজের আদর্শ।

* * *

অযোধ্যায় গিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে কয়েক বৎসর সুখে কাটালেন।

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন।

রাজকার্যে আর তাঁর মন নেই।

স্নেহের পুত্র রামচন্দ্রকে রাজা করে তিনি ভগবানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে চান।

কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হলো না।

তাঁর দ্বিতীয়া রাণী কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যেতে হলো।

ভরত রাজা হলো।

রামচন্দ্রকে সবাই প্রথমে বোঝাল। প্রজারা রামচন্দ্রের এ-ভাগ্যের জন্য অনেক কাঁদল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করার জন্য বনে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন।

সীতাদেবী বললে—হে প্রাণাধিক, একা কোথা যাবে? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।

রামচন্দ্র চমকে উঠলেন।

—প্রিয়তমা, তুমি—যাবে!

—আশ্চর্য হচ্ছ প্রাণাধিক? কেন, আমি যেতে পারি না? তুমি যেখানে যাবে, আমি অনুগামিনী হতে পারি না? তুমি চলে গেলে আমার এ-নারী জীবনের কি দাম, নাথ?

—ভেবে দেখ প্রিয়ে। তুমি কি বলছ, তুমি জান না। চৌদ্দ বৎসর আমাকে বনে বাস করতে হবে। এ চৌদ্দ বৎসর আমাকে অনাহারে, অনিদ্রায়, বনে-জঙ্গলে কি ভাবে দিন যাপন করতে হবে! আমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ থাকবে না সেখানে। থাকবে না কোন রাজৈশ্বর্য। নিঃসঙ্গ আমরা সেখানে।

—নাথ, তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ? বেশ পরীক্ষাই যদি করতে চাও, নিয়ে চল আমায় তোমার সাথে। দেখবে রাজৈশ্বর্য ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কত সুখে থাকব আমি শুধু তোমাকে নিয়ে।

কিন্তু তবুও রামচন্দ্র সকল কথা ভেবে সীতাকে নিয়ে যেতে একটু ইতঃস্তত করলেন।

সীতা স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন—স্বামী এখনো তুমি ভাবছ! জেনো, তোমার সঙ্গে তরুতলে থাকলেও আমি স্বর্গসুখ বলে মনে করবো। কুশকণ্টকে শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও আমি তা তোমার কোমল প্রেম-চুম্বন বলে অনুভব করব। কিন্তু তুমি আমাকে সঙ্গে না নিলে, শত রাজৈশ্বর্য, মহাসুখে রাখলেও আমি প্রাণত্যাগ করব।

এর পর রামচন্দ্র সীতাকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হলেন।

যথাসময়ে সকলকে ভালবাসা ও গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা চৌদ্দ বৎসরের জন্যে বনবাসে রওনা হলেন।

অনেক বন—নদী—পর্বত অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা পঞ্চবটী বনে এসে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

পঞ্চবটী বনে রাক্ষসদের ভয়ানক উৎপাত ছিল।

সেখানে ছিল রাবণের ভগ্নী সুর্পণখা।

সুর্পণখা বিধবা।

রামচন্দ্রকে দেখে তাঁর মনে প্রেম জাগল। তাই রামচন্দ্রের নিকট এসে বিবাহের প্রস্তাব করল।

রামচন্দ্র সীতাগত প্রাণ। সীতাহীন যাঁর প্রাণ মরুভূমি তিনি কি করে সুর্পণখাকে বিবাহ করবেন? তিনি সুর্পণখাকে লক্ষ্মণের নিকট পাঠালেন।

সুর্পণখা তখন লক্ষ্মণের নিকট গিয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিল।

লক্ষ্মণও বিবাহিত।

সুর্পণখার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল।

এতে রাবণের ভগ্নীর মনে খুব রাগ হলো। এবং সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সীতার ওপর।

সীতা বেঁচে থাকতে তার রাম বা লক্ষ্মণ কাউকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

তখন সুর্পণখা ছুটে এলো সীতাকে ভক্ষণ করতে।

লক্ষ্মণ বিপদ বুঝে বাণ মেরে সুর্পণখার নাক-কান কেটে দিলেন।

ভয়ানক অপমানে অপমানিতা হয়ে সুর্পণখা ছুটে গেলেন লঙ্কায় রাবণের কাছে।

লঙ্কার রাজা রাবণ তখন সভা জাঁকিয়ে বসেছিলেন।

চারিদিকে সভাসদ্ পাত্রমিত্র।

এমন সময় সুর্পণখা নাক-কান কাটা অবস্থায় সভায় গিয়ে উপস্থিত।

আসল কথা গোপন করে সুর্পণখা রাবণকে বলল—শোনো দাদা, এখানে বসে তুমি মহানন্দে দিন যাপন করছ। এদিকে পঞ্চবটী বনে রাম নামে এক সুন্দর যুবা পুরুষ এ দেখ আমার কি হাল করেছে!

সুর্পণখার কথা শুনে রাবণ চমকে উঠলেন! সে কি—দেবতারা যার খোসামোদ করে তার ভগ্নীর এ-অবস্থা কে করল? কার এতো বড় দুঃসাহস?

সূর্পণখা আবার বলল—রামচন্দ্র। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসেছে।

রাবণ হুঙ্কার দিয়ে বলল—যে জন্যই বনে আসুক—সে কি জানে না। সূর্পণখা রাবণের ভগ্নী?

—জানে দাদা, সব জানে। আমি তাকে সব বলেছি।

—তবু কেন সে তোর এ-অবস্থা করলে?

—রামচন্দ্র আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি রাজি হইনি। তাই আমার এ-অবস্থা।

—কিন্তু আমার সৈন্যবাহিনী কি করেছে।

—তাঁরা সবাই যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে।

—খর দূষণ আমার দু'ভাই?

—তারাও যুদ্ধে নিহত।

রাবণ এ সংবাদ শুনে কাতর হয়ে পড়লেন। ভ্রাতৃবিয়োগে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

সূর্পণখা বললে—শোনো দাদা, এর প্রতিশোধ নিতে হবে, উপযুক্ত প্রতিশোধ।

রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পত্নী আছে। অপূর্ব সুন্দরী সে। তোমার লঙ্কাপুরীতে এতো সুন্দরী নেই। তাকে যদি এ-লঙ্কাতে আনতে পারো তবেই হবে এর পূর্ণ প্রতিশোধ।

রাবণ হুঙ্কার দিয়ে বলল—তাই হবে—তাই হবে ভগ্নী। আমি দেখব সে রামচন্দ্র কতো শক্তি ধরে। তাঁর পত্নীকে আমার মহিষী করা চাই।

* * *

এরপর রাবণ ছদ্মবেশ ধরে সাধু সেজে সীতাকে পঞ্চবটী বন থেকে চুরি করে অশোক বনে নিয়ে রাখলো।

রামহীন সীতার জীবনে নরকযন্ত্রণা সুরু হলো।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রতিদিন আসে প্রেম নিবেদন করতে। সীতার রূপে মুগ্ধ সে।

কিন্তু রাবণের সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন সীতা।

রাবণ সীতার ওপর আরও ক্রুদ্ধ হয়।

অশোক বনে চেরীদের দিয়ে নানারকম নির্যাতন করে পাপিষ্ঠ রাবণ তাঁর মন ঘোরাবার জন্য।

তবু সীতাদেবী রাবণের প্রেমনিবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

রাবণ বলে—বল নারী, একটা ভিখারীকে তুমি ভালবেসে মরতে চাও, না এই স্বর্ণলঙ্কার রাজরাণী হয়ে বাঁচতে চাও?

সীতা হেসে বলেন—ওরে পাপিষ্ঠ, নারী চোর, অধম, আমাকে রাজরাণী করতে চাস? এখনো বলছি, যদি বাঁচতে চাস, জননী বলে সম্বোধন কর্। ওরে অধম, তুই আমাকে কি রাজরাণীর লোভ দেখাচ্ছিস? আমার যিনি স্বামী, তিনি রাজার রাজা।

সীতার কথা শুনে রাবণ হো-হো করে হেসে ওঠে।

রাবণ সীতার ওপর আরও নির্যাতন চালায়।

সীতাদেবী 'হা-রাম' 'হা-রাম' বলে তা অক্লেশে সহ্য করেন। রাবণের দেয়া কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন না তিনি।

রামচন্দ্র যখন জানতে পারলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর প্রিয়তমাকে চুরি করেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করলেন ও রাবণকে সবংশে বধ করে সীতা উদ্ধার করলেন।

কিন্তু সীতা অতোদিন রাবণের অশোক বনে ছিলেন। প্রজারা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পারে এই ভয়ে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন হলো।

সমুদ্রতীরে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হলো।

সীতা হাত জোড় করে অগ্নিকে জানালো—হে অগ্নিদেব, আমি যদি অসতী হই তবেই আমাকে শাস্তি দিয়ো। এই বলে সীতা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিন্তু আগুন সীতার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করলো না।

তখন সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলো।

ইতিমধ্যে চৌদ্দ বৎসর শেষ হয়েছিল।

সীতা-লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র মহানন্দে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

ভরত এতদিন রামের অবর্তমানে রাজ্য শাসন করছিলেন। রামচন্দ্র দেশে ফেরার সাথে সাথে তিনি দাদাকে সিংহাসনে বসালেন।

অযোধ্যানগর আবার আনন্দ সাগরে উথলে উঠল। এবার আরেক বিপদ ঘনিয়ে এলো।

সীতা দেবী এতো দিন রাক্ষস কবলে ছিলো। তাছাড়া প্রজারা সীতার অগ্নিপরীক্ষাও স্বচক্ষে দেখেনি। সুতরাং প্রজাকুল সীতার ওপর নানারূপ মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করতে লাগলো।

রামচন্দ্রের কানে এমন কুৎসা ভেসে এলো, রামচন্দ্র প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য পুনরায় সীতাকে বনে পাঠালেন।

সীতা আবার দুঃখের সাগরে ভাসলেন।

রাম বিহনে সীতার অন্তর আর্তনাদ করতে লাগল সর্বদা।

বাল্মীকি মুনির আশ্রমের সামনে সীতাকে লক্ষ্মণ রেখে এসেছিলেন।

বাল্মীকি মুনি সীতাকে দেখতে পেয়ে নিজের আশ্রমে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন।

সীতা তখন পূর্ণগর্ভা।

সেখানে তাঁর যমজ সন্তান হয়।

রাজকুমারদ্বয়ের জন্মের কথা মুনি রামলক্ষ্মণকে জানালেন না। তিনি তাঁদের সর্বশাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিখালেন। বাল্মীকি রামায়ণ নামে একখানি বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সীতার দুই সন্তান লব ও কুশকে সে কাব্যখানা গান করতে শিখিয়েছিলেন।

লব কুশের মুখে সীতা রামায়ণ গান শুনে স্বামীকে মনে মনে ধ্যান করতেন ও স্বামী দুঃখ ভুলে যেতেন।

এরপর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন।

সে-যজ্ঞে রামায়ণ গান করার জন্য বাল্মীকি মুনি লব কুশকে নিয়ে এলেন। রাম-লক্ষ্মণ ভরত-শত্রুঘ্ন ও প্রজারা সকলেই এ-দুটি বালকের রামায়ণ গান শুনে মুগ্ধ হলেন।

রামচন্দ্র ওদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

কিন্তু যখন জানলেন এ-দুটি শিশু তাঁরই সন্তান, তখন রামচন্দ্রের .বদনার অবধি রইল না।

তাঁর সব কথা মনে পড়ে গেল।

সীতার জন্য তাঁর মন আবার ব্যাকুল হয়ে পড়ল। রামচন্দ্র সীতাকে আনতে পাঠালেন।

বাল্মীকি সীতাকে অযোধ্যায় আনলেন।

সীতার মনে স্বামীর জন্য কোন রাগ বা দুঃখ ছিল না। সে জানতো রামচন্দ্র তাঁর প্রতি যতই অবিচার করে থাকুন না কেন, তিনি তা নিজের ইচ্ছায় করেন নি।

কেবলমাত্র প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যই তিনি সব করেছেন। তাই স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি কিছুমাত্রও বিচলিত হয় নি।

কিন্তু সীতাকে গ্রহণ করার কথা উঠতেই প্রজারা আবার আপত্তি জানাল। পুনরায় পরীক্ষা না করে সীতাকে গ্রহণ করা যাবে না, গুঞ্জন উঠল সভায়।

আবার পরীক্ষার কথা শুনে, সীতার নিজের প্রতি অত্যন্ত ধিক্কার এলো। এ অপমানিত কথা সীতা আর শুনতে পারলেন না। তিনি নিজে তো জানতেন, তিনি কতোখানি সতী!

তাই কাঁদতে কাঁদতে বসুন্ধরাকে বললেন—ভগবতী বসুন্ধরে—দ্বিধা হও। আমি তোমার বুকে আশ্রয় নিই।

সহসা সীতার এ-কথায় মাটি দু'ভাগ হয়ে গেল। সীতা মাটির ভেতর প্রবেশ করলেন।

সীতা মাটি হতে উঠেছিলেন—আবার মাটিতেই লীন হয়ে গেলেন।

শৈব্যা

দেবতারা সৎ মানুষের জীবন নানারকম ভাবে যাচাই করেন। ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্র নামে মহাপ্রতাপ শালী এক ঋষি ছিলেন।

এবং সেই যুগেই সূর্যবংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক দানবীর রাজা ছিলেন।

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের কথা অনেক শুনেছেন। কিন্তু কোন পরিচয় পান নি। একবার হরিশ্চন্দ্রের দান সম্বন্ধে ঋষির মনে পরীক্ষা করার বাসনা খুব প্রবল হল।

তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

অতি সহজেই একবার খুব সুযোগ জুটে গেল।

তখনকার দিনে মৃগয়ার খুব চলন ছিল।

মৃগয়া মানে, শিকার। তখনকার দিনে বড় বড় রাজারা সৈন্যসামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে খুব জাঁকজমক করে শিকার করতে বের হতেন।

একবার হরিশচন্দ্র সেরকম মৃগয়ায় বের হলেন।

রাজ মৃগয়া করতে করতে এক বাগানে এসে উপস্থিত হলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি নারীর আর্তনাদ শুনতে পেলেন।

রাজা খুব দাতাই ছিলেন না দয়ালুও ছিলেন।

পরের কষ্টে দেখলেই তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত।

আর্তনাদ শুনেই তিনি সেদিকে চললেন।

গিয়ে দেখেন, কয়েকজন নারী লতাগুল্মদ্বারা গাছে বাঁধা, তাঁরাই আর্তনাদ করছেন।

রাজা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের মুক্তি দিলেন।

ঐ নারীরা ছিলো শাপগ্রস্তা দেবকন্যা। মুক্তি পেয়ে তাঁরা সমস্ত মায়ার বন্ধনমুক্ত হলেন ও স্বর্গে চলে গেলেন।

এ কথা বিশ্বামিত্র জানতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার নিকট ছুটে এসে এর কৈফিয়ৎ চাইলেন।

রাজা বিশ্বামিত্র মুনিকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে মাথা নত করলেন। ও ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি বললেন—তুমি আমার আশ্রমে এসে, আমার সাধনার ব্যাঘাত করেছ ও এ রাজ করে নিয়ম বিরোধী কাজ করেছ!

রাজা মাথা নত করে বললেন,—তার জন্য আপনি যা বলবেন তাই করতে রাজি আছি। যা চাইবেন তাই দিতে রাজী আছি। কিন্তু ঐ ক্রন্দনরতা নারীদের আর্তনাদ শুনে আমার মন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। দয়া মানুষের পরম ধর্ম। তাই আমি ওদের মুক্তি দিয়েছি।

রাজার কথা শুনে বিশ্বামিত্রের আরও রাগ হলো। বললেন—বটে। দয়া—দাক্ষিণ্য! এতে তোমার বড় বড়াই! দাতা বলে তোমার বড় গর্ব! বলো, এর বিনিময়ে আমাকে তুমি কি দান করতে পারো! আমি একজন সামান্য ঋষি মাত্র।

হরিশচন্দ্র সবিনয়ে বললেন—বলুন ঋষি—কি দান পেলে আপনি আনন্দিত?

—আমি যা চাইবো তুমি দিতে পারবে রাজা? খুব ভাল করে ভেবে দেখ।

—ভেবে দেখার কিছু নেই ঋষি। আপনি বলুন।

—সে দান যদি অতি ভয়ঙ্কর হয়?

—মাথা পেতে নেবো আমি।

—বেশ তবে তাই হোক। তোমার এই সসাগরা পৃথিবী আমাকে দান কর রাজা।

—আপনার এ প্রার্থনা আমি সানন্দে মাথা পেতে নিলাম মহর্ষি।

ঋষি আর চাইলো—তার সঙ্গে দক্ষিণাস্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা সেই ভাবেই মাথা নত করে বললেন—আমি প্রস্তুত। আজ হতে সবই আপনার।

—কিন্তু রাজা এক কথা—রাজ্য-রাজভাণ্ডার যখন সবই আমায় দান করেছ, তখন সবই আমার। রাজকোষ থেকে এক কপর্দকও তোমার নেবার বা দান করার অধিকার নেই। দক্ষিণা তোমাকে আজ থেকে স্ব-চেষ্টায় উপার্জন করে দিতে হবে।

— তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।

—আরও একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে রাজা—

—বলুন।

—এ-পৃথিবী এখন আমার। এখানে বাস করার তোমার আর অধিকার নেই। [illegible] দান গ্রহণ হয়। বারাণসী এ-রাজ্যের বাইরে। তোমাকে [illegible] হবে। আর তিন দিনের মধ্যে আমার দক্ষিণা পরিশোধ [illegible]।

—আপনার [illegible] আমি মাথা পেতে প্রস্তুত। আমি আপনাকে আমার সর্বস্ব দান [illegible] রাজ্য-ধন [illegible] আজ থেকে এ-সসাগরা পৃথিবীর আপনি [illegible]।

রাজার মুখে এ-কথা শুনে বিশ্বামিত্র [illegible] হয়ে গেলেন।

* * *

এ হরিশ্চন্দ্র রাজারই পত্নী শৈব্যা।

স্বামী যখন রাজপ্রাসাদে ফিরে শৈব্যাকে সব কথা খুলে বললেন—তখন তাঁর কোন দুঃখ হলো না।

একমাত্র পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে বারাণসীতে এসে পৌঁছুলেন, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র আর তাঁর পত্নী শৈব্যা।

কিন্তু বারানসী এসেও তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না।

কি করে নিশ্চিন্ত থাকবেন ?

এখনো তাঁদের দক্ষিণা দান বাকী।

এ-দক্ষিণা তাঁরা কোথা থেকে দান করবেন।

যা ছিলো, সব দান করেছেন। রাজৈশ্বর্য। এখন অর্থ কোথা পাবেন?

সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সামান্য না। রাজা থাকলে, রাজৈশ্বর্য থাকলে দিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হতো না। এখন ভিখারী হরিশ্চন্দ্রের হাতে এক কপর্দকও নেই।

এ-জন্য হরিশ্চন্দ্র কাতর হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন—হে ভগবান, এখন তুমিই আমার একমাত্র সহায়। আমাকে অধর্মে ফেলো না।

ভগবান তাঁদের এ-প্রার্থনা শুনলেন।

তখন দাসত্বপ্রথা ছিলো।

টাকা দিয়ে মানুষ কিনে ধনীরা তখন দাস খাটাত।

এক চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে কিনলেন।

বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ রাজাকে কিনলেন।

এভাবে রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর পত্নী দাস হয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দান করলেন।

মহর্ষি সন্তুষ্ট হলেন।

* *

সমস্ত দান করে মহারাণী শৈব্যা এখন ক্রীতদাসী।

যে দেহ পূর্বে নিত্যনূতন বেশ-ভুষায় আচ্ছাদিত থাকত, রাজভোগে পরিপুষ্ট হতো, এখন সেই দেহ ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে অর্ধাবৃত হতে লাগল।

অনাহারে-অর্ধাহারে সে দেহ জীর্ণ হতে লাগল।

ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে কিনেছিলেন।

রাজপুত্র রোহিতাশ্বকে কেনেন নি।

সুতরাং তিনি রাজপুত্রকে খেতে-পরতে দিতেন না।

মহারাণী নিজের অধিকাংশ খাদ্য পুত্রকে দিয়ে রোহিতকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অঘটন ঘঠলো।

শৈব্যা যে ব্রাহ্মণের কাছে চাকরী করতেন তাঁর পূজোর জন্য রোহিত একদিন বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে সর্পদংশনে মারা গেল।

একমাত্র রাজপুত্র, শৈব্যার একমাত্র নয়নমণি, শেষ অবলম্বন রোহিত মারা গেলে অভাগিনীর হৃদয় হাহাকার করে উঠলো।

শেষে একাই নিজ মৃত পুত্রকে বক্ষে নিয়ে সৎকারের জন্য শ্মশানে গেল।

এদিকে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করে তাঁকে শ্মশানে শব সৎকারের চাকুরীতে নিযুক্ত করেছিল।

শবদাহকারীদের নিকট হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক গ্রহণ, তাহাদের শবদাহকার্যে সহায়তা, এগুলোই এখন তাঁর কাজ।

আকাশ ভীষণ অন্ধকার।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং ঝড়।

এ-ভয়ানক রাত্রে শৈব্যা মৃত রোহিতাশ্বকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে এলেন। নারীর ক্রন্দন শুনে রাজা হরিশচন্দ্র এগিয়ে এলেন, এবং ব্যথিত হয়ে বললেন—আমার প্রাপ্য রেখে তুমি চলে যাও। আমি তোমার পুত্রের সৎকার করব।

শৈব্যা তখন আক্ষেপ করে বললেন—আমার এক কপর্দক দেবারও ক্ষমতা নেই। আজ আমি একজন ক্রীতদাসী। কিন্তু একদিন আমার সব ছিল। রাজ্য রাজভাণ্ডার। সে সব এখন আমার কিছুই নেই। আমার স্বামীও সত্যরক্ষার জন্য এখন একজন ক্রীতদাস।

রাজা হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন! কি বললে তুমি! কি বললে—একদিন তোমার সব ছিল, আজ তুমি ক্রীতদাসী! তোমার স্বামী ক্রীতদাস কে—কে তুমি? তোমার পরিচয় দাও।

আমি এ-সসাগরা পৃথিবীর মহারাণী ছিলাম। আমার নাম শৈব্যা। আমার স্বামীর নাম—

—শৈব্যা—! শৈব্যা !! তুমি শৈব্যা—হা ভগবান। এক মুহূর্তের জন্য আমাকে স্থির করে দাও। শৈব্যা—প্রিয়তমা—আমিই সেই হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র, ক্রীতদাস।

—তুমিই মহারাজা—আমার প্রিয়তম! হা ভগবান! স্বামী—দেখ, আজ আমাদের প্রিয় পুত্রের কি অবস্থা! সর্পদংশনে মৃত।

—হা রোহিতাশ্ব! প্রিয়তম পুত্র আমার।

* *

যখন মহাশ্মশানে এরকম ভাবে স্বামী-স্ত্রী কাঁদছিলেন, তখন অভাবনীয় ভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল।

বিশ্বামিত্র এ-সব দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে বললেন—বাঃ হরিশ্চন্দ্র—তুমি ধন্য, তোমার দানে আমি মুগ্ধ! অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেও তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা থেকে বিস্মৃত হওনি। সত্যিই তোমার দান প্রশংসাযোগ্য। আমি তোমাকে পরীক্ষামাত্র করলাম। এখন তোমাকে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিলাম।

এ-কথা শুনে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা বিশ্বামিত্রকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলেন। বললেন—কিন্তু ঋষি; আমার পুত্র?

—চেয়ে দেখ, তোমার পুত্র জীবিত।

মন্ত্রবলে বিশ্বামিত্র রোহিতাশ্বকে বাঁচিয়ে দিলেন। এবং হরিশ্চন্দ্রকে আবার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে নিয়ে আবার রাজ্যে ফিরে এলেন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন।

প্রজাগণ হরিশ্চন্দ্রের জয়ধ্বনি দিলো।

সাবিত্রী

প্রাচীনকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন।

তাঁর সংসারে টাকা-পয়সা হাতী ঘোড়া বিষয়সম্পত্তি কোন জিনিষেরই অভাব ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি সুখী ছিলেন না। কারণ এই অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করার জন্য তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না।

অবশেষে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর পূজা করে এক কন্যারত্ন লাভ করলেন। তাই কন্যার নাম রাখলেন সাবিত্রী।

দেবতার বর প্রাপ্ত কন্যা দেবতার মতই রূপসী হ'ল। তার রূপের ছটায় দিক দিগন্ত আলোকিত হ'য়ে উঠে। ক্রমে ক্রমে যৌবনের সীমারেখায় পা দিল সাবিত্রী।

কন্যাকে বিয়ের উপযুক্ত দেখে পাত্রের অনুসন্ধান করতে লাগলেন পিতা অশ্বপতি। কিন্তু কোথাও তার উপযুক্ত পাত্র না পাওয়াতে তিনি তাঁর কন্যাকেই স্বয়ং তার পতির সন্ধান করতে অনুরোধ করলেন।

পিতার আদেশে সাবিত্রী স্বয়ং পতির অন্বেষণে বের হ'লেন॥

পতির অনুসন্ধানে বহু দেশ ভ্রমণ করলেন। কিন্তু মনের মত পতি পেলেন না। অবশেষে তিনি এসে হাজির হ'লেন এক তপোবনে।

এদিকে শাল্বদেশের রাজা বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্থ ও দৃষ্টিশক্তি হীন হয়ে পড়লে তাঁর শত্রুরা তাঁর কাছে থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর শত্রুদের দ্বারা রাজ্য হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে পত্নী ও পুত্র সত্যবানকে নিয়ে তিনি ঐ তপোবনে বাস করছিলেন।

ঐ বনের ভেতরে সত্যবানের সাথে অকস্মাৎ এক শুভ মূহূর্তে সাবিত্রীর দেখা হ'য়ে গেল। সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁকে মনে মনে স্বামিত্বে বরণ করে নিলেন।

স্বামী নির্বাচনে সফল হ'য়ে তিনি তখন ফিরে এলেন তাঁর পিতার কাছে।

তাঁর পিতা তখন দেবর্ষি নারদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন।

এসব কথা শুনে নারদ বললেন—সত্যবানের পরমায়ু মাত্র এক বৎসর আছে।

অশ্বপতি সাবিত্রীকে অন্য কোন পতি মনোনীত করতে বললে তিনি বললেন—আমি মনে মনে সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করে নিয়েছি। অবার অপরকে কি করে বিয়ে করে দ্বিচারিণী হব? সত্যবান স্বল্পায়ু হ'লেও তিনিই আমার স্বামী!

কন্যার দৃঢ় পণ দেখে বাধ্য হ'য়ে অশ্বপতি শাল্বরাজের পুত্র সত্য-বানের হাতে তাঁর একমাত্র কন্যা সাবিত্রীকে সম্প্রদান করলেন।

সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ীর সাথে তপোবনেই বসবাস করতে লাগলেন।

নারদ মুনির কথাটা সব সময়েই তাঁর মনে ছিল। তিনি সব সময়েই সেই দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন আগে থেকে স্বামীর মঙ্গল কামনায় তিনি ত্রিরাত্রিব্রত আরম্ভ করলেন। অবশেষে এল সেই অশুভ দিন।

প্রতিদিনের মত সত্যবান কাঠ কাটতে বের হ'লে সাবিত্রীও সে দিন তাঁর সাথী হ'লেন।

কাঠ কাটতে কাটতে সত্যবানের মাথায় হঠাৎ যন্ত্রণা সুরু হ'য়ে গেল। তিনি অস্থির হ'য়ে সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি জ্ঞান হারালেন।

একে তো বিপজ্জনক এই রাত। তাছাড়া দেখতে দেখতে রাতের অরণ্য আরও ভীষণ রূপ ধারণ করল। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এক দেব জ্যোতি বিকশিত হ'য়ে উঠল।

সাবিত্রী চেয়ে দেখলেন—হস্তে দণ্ড, মস্তকে কিরীট, অঙ্গে জ্যোতিঃ-পুঞ্জ—এক বিরাট মূর্তি!

সাবিত্রী প্রণাম করলে, দেবতা বললেন—মা সাবিত্রী। আমি ধর্মরাজ যম। তোমার স্বামীর পরমায়ু শেষ হ'য়েছে। আমার অনুচরেরা তোমার সতীত্বের তেজে অগ্রসর হ'তে না পারার জন্যে আমি স্বয়ং এসেছি। তুমি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করে নিজ গৃহে ফিরে যাও। মর্ত্তবাসী সকলেরই একদিন মৃত্যু ঘটে থাকে। আশা করি তাই তুমি দুঃখ করবে না।

যমরাজের অনুরোধে সাবিত্রী সত্যবানের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালে যমরাজ সত্যবানের দেহস্থিত আত্মাটিকে গ্রহণ করে এগিয়ে চললেন।

সাবিত্রীও তাঁর অনুসরণ করলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে তাঁর অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন।

সাবিত্রী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে যমরাজকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—ধর্মরাজ! আপনিই তো বলেছেন—মৃত্যুই বিধির বিধান। আবার সেই বিধির বিধানেই লেখা আছে সতী পতির আত্মার সাথে চির অবিচ্ছিন্ন; সুতরাং সেই বিধির বিধানমতই ত আমি আমার স্বামীর অনুসরণ করতে বাধ্য। আপনি তাহ'লে আমায় নিষেধ করছেন কেন?

যমরাজ বললেন—তোমার ধর্মজ্ঞান দেখে আমি খুব খুশী হ'য়েছি। তুমি তোমার স্বামীর জীবন ছাড়া অন্য যে কোনও বর প্রার্থনা কর।

—তাহলে আপনি দয়া করে আমার অন্ধ শ্বশুরের চক্ষু ফিরিয়ে দিন।

—তথাস্তু

যমরাজ আবার কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে সাবিত্রীকে তাঁর পিছন পিছন আসতে দেখে বললেন—দেবী! তুমি কেন এখনও আমার পেছনে এ ভাবে অনুসরণ করছো? তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, তাই তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তবে তোমার উপর আমি বড় খুশী হ'য়েছি। তুমি তোমার স্বামীর প্রাণ ভিন্ন অন্য যে কোন একটি বর প্রার্থনা কর।

—তাহলে দয়া করে আমার শ্বশুরের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিন।

—তথাস্তু।

সাবিত্রী তবুও যমরাজকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তা দেখে যমরাজ বললেন—তবু অনর্থক কেন আসছ মা? তোমাকে ত আমি দুটি বর দিলাম।

—দেখুন, আমি গৃহে ফিরতে পারব না, কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে আমার স্বামীর আত্মার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার-স্বামী যেদিকে যাবেন আমিও সেদিকে যাব। আমায় আপনি নিষেধ করবেন না।

—তোমার স্বামীর জীবন ভিন্ন তুমি অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর।

—তাহলে আমার পিতা একটি পুত্র সন্তান লাভ করুন।

—তথাস্তু বলে যমরাজ এগিয়ে চললেন। আবার পেছনে ফিরে সাবিত্রীকে দেখে তিনি বললেন—মা, তুমি বড় অবুঝের মত কাজ করছো। স্বামী পাপ করে নরকে গেলে স্ত্রীকেও কি সেখানে যেতে হবে?

—ধর্মরাজ! স্ত্রী স্বামীর জীবন-মরণ, ধর্ম-কর্ম, পাপ-পুণ্যের সাথী! স্বামী নরকে গেলেও আমি তার অনুসরণ করব।

—দেখ, তোমার ধর্মজ্ঞানে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হ'য়েছি। কিন্তু যার আয়ু শেষ হ'য়েছে তাকে বাঁচাবো কি করে? অতএব তুমি তোমার স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন একটি বর প্রার্থনা কর।

—প্রভু! আপনি যদি সত্যিই আমাকে বর দিতে চান তবে এই বর দিন যে সত্যবানের ছেলে যেন রাজা হয়।

—তথাস্তু।

যমরাজ বর দিয়ে এগিয়ে চললেন। কিয়ৎ দূর গিয়ে পেছন ফিরে সাবিত্রীকে আবার তাঁর পেছনে আসতে দেখে বিরক্ত হ'য়ে বললেন—তোমার ইচ্ছামত সব বরই তো আমি তোমায় দিয়েছি? আর তোমার কি চাইবার আছে? তোমার স্বামীর মৃত্যু হ'য়েছে। তুমি এবার ঘরে ফিরে যাও।

—ধর্মরাজ! কিছু আগে আপনি আমায় বর দিয়েছেন যে, সত্যবানের ছেলে রাজা হবে, কিন্তু তিনি ত মৃত, তাহ'লে এটা কি করে সম্ভব? আপনার কথা তবে কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

ধর্মরাজ বুঝতে পারলেন এই বালিকার বুদ্ধির কাছে তিনি পরাভূত হ'য়েছেন। সন্তুষ্ট চিত্তে যমরাজ তখন তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিলেন।

পতিব্রতা নারীর পতি ভক্তির কাছে মৃত্যুকেও পরাজয় বরণ করতে হ'ল।

সত্যবান কিন্তু এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি ঘুম থেকে যে উঠে বসলেন। তারপর সাবিত্রী কেন সারারাত তার ঘুম ভাঙ্গায় নি তার জন্যে তাকে অনুযোগও করলেন। তখন সাবিত্রীর মুখে সব কথা শুনে তিনি পত্নী গৌরবে ধন্য হ'য়ে গৃহে ফিরে আরও আনন্দিত হ'লেন। সেখানে দেখলেন তাঁর পিতা দর্শনক্ষম হ'য়েছেন এবং রাজ্যের অমাত্যগণ তাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে এসেছেন।

সাবিত্রীর অপুত্রক পিতার পুত্র সন্তান হল। সাবিত্রীও পুত্রের জননী হ'য়ে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। এইভাবে সাবিত্রী নিজ সতীত্বের মহিমায় পিতার বংশ ও নিজ বংশ দুটি বংশকেই উদ্ধার করলেন।

যে স্বামীর এরূপ সতীসাধ্বী স্ত্রী থাকে স্বয়ং যমও সেখানে এগিয়ে যেতে সাহস পান না।

পার্বতী

পর্বত রাজ হিমালয়ের ছিল অনেকগুলি পুত্র সন্তান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মেনকা এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একটি কন্যার জন্যে মনে-প্রাণে কামনা করছিলেন। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে ও মহাদেবের তপস্যা সফল করতেই সতী পার্বতী নাম নিয়ে এই মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন।

দিনে দিনে তার রূপ যোল কলায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। সমস্ত দেবতা ও অসুররা তার রূপে পাগল হ'য়ে তাকে নানারূপে প্রলোভিত করতে লাগল।

কিন্তু পার্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মসংযম না করতে পারলে প্রেমের জন্ম হয় না। দীর্ঘদিন তপস্যার পর সাধক মহাদেবের আসন টলল। মহাদেব তাকিয়ে দেখেন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান তপঃক্লিষ্টা পার্বতী—তাঁরই ধ্যানে বিরত। মহাদেব তখন সতী রূপী পার্বতীর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হ'লেন।

কঠোর আত্মসংযম কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রকৃত সাধনা ও প্রেম যুগে যুগে তাদের ইপ্সিত বস্তুকে কাছে পায়।

মহাদেবের সাধনা ও সতীর প্রেম পরজন্মেও তাদের মিলন ঘটাতে সমর্থ হ'য়েছিল।

প্রকৃত প্রেম কতো গভীর, কতো সুন্দর সতীর জীবনী থেকে বুঝতে পারা যায়।

দময়ন্তী

প্রাচীনকালে বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক মহা পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য-শালী রাজা বাস করতেন! কিন্তু তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। তাই তিনি খুব অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে দমন মুনির বরে তিনি দমন নামে এক পুত্র ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন।

দময়ন্তীর যেমন ছিল রূপ, তেমনি তার গুণ। তার রূপে ও গুণে সকলে মুগ্ধ হয়েছিল। ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করলে তার রূপ এবং গুণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা তখন রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করলেন।

এমন সময় একদিন।

দময়ন্তী তার অন্তঃপুরের মধ্যে একটি মনোরম উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় একটি সুন্দর রাজহংস তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। কৌতূহলী হ'য়ে দময়ন্তী হাঁসটিকে হঠাৎ ধরে ফেললেন।

হাঁস দময়ন্তীকে বলল—আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমায় নলের কথা বলব। তার কথা তুমি কখনো শোননি।

এর আগে দময়ন্তী নলের কথা অনেকবার লোকের মুখে শুনেছিলেন। তাই এই হাঁসটি কি বলে তা জানবার জন্য তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন।

হাঁসটি দময়ন্তীর কাছে নলের রূপ-গুণ এবং তাঁর প্রতি আসক্তির কথাও বলল।

দময়ন্তী তখন মনে মনে নলকেই পতিত্বে বরণ করলেন। হাঁসটি স্বস্থানে প্রস্থান করল।

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল সেই স্বয়ম্বরের দিন।

কিন্তু সভায় এসে দময়ন্তী বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। তিনি দেখলেন ঠিক নলের মত আরও চারজন পুরুষ বসে আছেন।

দময়ন্তী বুঝতে পারলেন না এর মধ্যে প্রকৃত নল কে? তবে তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে, এটা দেবতাদের ছলনা।

তখন তিনি মনে মনে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মিনতি করে বলতে লাগলেন—হে দেবতানন্দ! আপনারাই ধর্মরক্ষক। আপনারা জানেন যে সত্যধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু নারীর আর নেই। আজ আমার সত্যধর্ম আপনারই রক্ষা করুন।

তখন সতী দময়ন্তী হঠাৎ দেখতে পেলেন একজনের সঙ্গে ঐ চারজনের ভেতর কিছু পার্থক্য আছে। ঐ চারজনের কোন ছায়া পড়েনি মাটিতে। তাদের গায়ে ঘাম নেই। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁরা দেবতা।

প্রকৃত নলকে চিনতে তখন খুব কষ্ট পেতে হ'ল না দময়ন্তীর। তিনি প্রকৃত নলের গলায় মালা দিয়ে তাঁর সতীত্ব ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

বেশ কয়েকটা বছর তারা বেশ সুখেই কাটালেন। কিন্তু সে সুখ বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। নলের ছোট ভাই পুষ্কর দাদার এই সুখ সহ্য করতে পারল না। সে একদিন তাকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করলো। পণ রেখে পাশা খেলা সুরু হ'ল। এই খেলায় একে একে রাজ্য ধন সব হারিয়ে নলকে বনবাসী হ'তে হ'ল। তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।

সতী দময়ন্তী স্বামীর অনুগামিনী হ'তে চাইলে তিনি বললেন—প্রিয়ে! আমি নিজের দোষেই সব হারিয়ে দুঃখকে বরণ করে নিয়েছি। তুমি কেন অনর্থক আমার সঙ্গী হবে?

প্রত্যুত্তরে দময়ন্তী বললেন—স্ত্রী কি কেবল সুখের সাথী দুঃখের সাথী কিসে নয়? আপনার সুখের দিনেও আমি যেমন আপনার পাশে ছিলাম আপনার দুঃখের অংশভাগিনী হ'য়েও আমি তেমনি আপনার পাশে থাকবো। আপনি যেখানে থাকবেন সেটাই আমার স্বর্গ। সেই আমার পরম ধর্ম। আমি আমার জন্য বিন্দু মাত্র চিন্তা করিনা যতটা করি আপনার কষ্ট হ'চ্ছে দেখে।

এক বস্ত্রে নল বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন। একদিন একটি সোনার

পাখী ধরতে গিয়ে নল তার পরনের বসনখানি হারালেন। তখন দময়ন্তী তার নিজ বসনের অর্ধেক স্বামীকে পরতে দিলেন।

দময়ন্তীর কষ্ট হচ্ছে দেখে একদিন নল তাকে বললেন—তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে তুমি কিছুদিন তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাক। কর্মফল আমি একাই ভোগ করব। তুমি চিন্তা করোনা।

কিন্তু দময়ন্তী কিছুতেই তার স্বামীর এই দুঃসময়ে তাকে ত্যাগ করে গেল না।

তখন বাধ্য হ'য়ে একদিন নিদ্রিত দমনন্তীকে ত্যাগ করে, তার ভার ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি সেই বন ত্যাগ করলেন।

ঘুম থেকে উঠে দময়ন্তী দেখলেন, তাঁর স্বামী তার পাশে নেই। তিনি পাগলিনী প্রায় হ'য়ে বনে বনে তাঁর স্বামীর অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না। ইতিমধ্যে একটি অজগর সাপ তাঁকে তাড়া করল। সাপের ভয়ে তিনি ছুটতে লাগলেন! ঠিক তখন দূর থেকে একটি ব্যাধ সাপটিকে মেরে তাঁর জীবন রক্ষা করল। দময়ন্তী তার জীবন দাতা ব্যাধকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাধ নিজ স্বরূপ ধারণ করল। সে তার পাপাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য এগিয়ে এলে তাকে ধিক্কার দিয়ে দময়ন্তী সে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

ছিন্ন বস্ত্রে অনাহারে অনিদ্রায় ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে তিনি চেদী রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এই চেদী রাজ্যে বেড়াতে বেড়াতে একদিন তিনি রাজ প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পড়লে রাজমাতা তাঁকে ডাকিয়ে এনে তাঁর পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে সস্নেহে সেখানে আশ্রয় দিলেন এবং তিনি তার লোকজনকে নলের অনুসন্ধানে পাঠালেন।

নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করে বেশ কিছুদূর এসে দেখতে পেলেন একটি সাপ আগুনে পুড়ে মরছে। তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঐ সাপটিকে আগুন থেকে বাঁচালেন। সাপটি তার হিংস্র স্বভাব অনুযায়ী নলকে দংশন করল। তার দংশনে নলের সর্ব

শরীর বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রণ ইত্যাদি দ্বারা বিকৃত হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাবল. এটাই তার উপযুক্ত ছদ্মবেশ হয়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারবে না।

অশ্ববিদ্যাতে নলের বেশ সুখ্যাতি ছিল। তাই সেই বিদ্যাটাকে তিনি কাজে লাগাবার জন্য অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কাজ জোগাড় করে নিলেন। নিজের নামটাও তখন পালটে দিলেন। তখন তার নাম হ'ল বাহক।

বিদর্ভরাজ তার কন্যা ও জামাতার বনগমন সংবাদে অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হ'য়ে তাঁদের বাড়ীতে আনবার জন্য দূত পাঠালেন। নানা দেশ, বন উপবনে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে তারা এসে উপস্থিত হ'ল চেদী রাজ্যে। সেখানে দময়ন্তীর সন্ধান পেয়ে তাকে সাদরে বিদর্ভ রাজ্যে নিয়ে গেল। দময়ন্তী পিতৃগৃহে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেলেন।

বাপের বাড়ীতে এসে এত সুখের ভেতর থেকে দময়ন্তী আরও অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন। সব সময়েই তার স্বামীর জন্য চিন্তা বেড়ে গেল। সব সময়েই সে ভাবত, আমি এত সুখে আছি আর তিনি কষ্টে কত বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কন্যাকে এরূপ কাতর দেখে পিতা তাঁর জামাতার খোঁজে আবার তার অনুচরবর্গকে পাঠালেন।

বেশ কিছুদিন পরে এক দূত এসে দময়ন্তীকে ঋতুপর্ণের সারথির কথা বলল।

তার গুণের পরিচয়, দময়ন্তীর প্রতি তার অনুরাগ, ইত্যাদিতে দময়ন্তী তাকে নল বলেই মনে করিলেন। কিন্তু রূপের বর্ণনায় তিনি একটু সন্দিহান হ'লেন। তাই তিনি তাকে দেখবার জন্য একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

ঋতুপর্ণের কাছে এক দূত পাঠিয়ে দময়ন্তী জানালেন যে—আমার দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভা উপস্থিত। অতএব ঋতুপর্ণ যদি সেখানে উপস্থিত হ'তে চান তো আসতে পারেন।

ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা আগেই শুনেছিলেন। তাই তিনি তার কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

নল কিন্তু এই কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন এটা বোধ হয় কৌশল। যা হোক, নল ঋতুপর্ণের সারথি হ'য়েই তাঁর সঙ্গে বিদর্ভে যাওয়া ঠিক করলেন।

বিদর্ভে এসে হাজির হওয়ার সাথে সাথে দময়ন্তী সারথীকে ডাকিয়ে এনে নিভৃত কক্ষে তার আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি দেখে তাকে নল বলে চিনতে পারলেন। এইভাবে দুটি অতৃপ্ত হৃদয় মিলনাশ্রু দ্বারা মিলিত হল।

এরপর নল তার ভাই পুষ্করকে আবার পাশা খেলায় আহ্বান করলেন। এবার পাশা খেলায় তাকে হারিয়ে দিয়ে তিনি আবার তার হৃত রাজ্য ফিরে পেলেন।

সতীর জ্যোতিতে নলের কাল রূপও হার স্বীকার করে। ধীরে ধীরে নল নিজ রূপ ফিরে পেলো।

অরুন্ধতী

নারী জাতি অর্থাৎ ভারতের নারীদের ইতিহাসে সমস্ত বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে গরীমায়, সতীত্বে ও ক্ষমতায় অরুন্ধতীর মত নারী বিরল।

বশিষ্ট পত্নী অরুন্ধতী সত্যিই চিরযুগের পূজ্যা ও শ্রদ্ধার পাত্রী।

শাস্ত্রকারদের প্রবচন অনুযায়ী যা জানা যায় তা হলো—ব্রহ্মার মানস কন্যা সন্ধ্যাই অরুন্ধতীরূপে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় তিনি কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। কিন্তু বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হন। তাঁর তপস্যায় কোন ত্রুটিই ছিল না। কিন্তু তবুও কেন যে তিনি আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎলাভে

বঞ্চিত হ'লেন সেই কথা ভেবে ভেবেই তিনি আরও শীর্ণকায় হ'য়ে পড়লেন।

শাস্ত্রে আছে কোন গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। অরুন্ধতী দীক্ষা না নেওয়ায় তাঁকে এইরূপ বিপদে পড়তে হ'য়েছিল।

তাঁর এই কঠোর তপস্যায় দেবতা ব্রহ্মার দয়া হ'ল। তিনি তখন নিজে এসে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। সন্ধ্যা ব্রহ্মার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে আবার কঠোর সাধনা সুরু করলেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু এসে তাঁকে ইপ্সিত বর প্রার্থনা করতে বললেন। সন্ধ্যা সুখ-শান্তি, ধন-ঐশ্বর্য্য, রাজ-বৈভব প্রভৃতি কিছুই না চেয়ে শুধু পাতিব্রত্য বর কামনা করলেন।

বিষ্ণু বললেন—তুমি তোমার তপের ফল স্বরূপ মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে। ঐ জন্মে তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তুমি সেখানে সতীত্বের চরম আদর্শ দেখিয়ে অবশেষে স্বামীর সাথে নক্ষত্রমণ্ডলে চিরদিন বাস করবে।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ঋষি মেধাতিথি জগতের মঙ্গলার্থে চন্দ্রভাগা নদীর ধারে একটি তপোবনে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। স্বর্গের সব দেবতাই সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সব দেবতারাই মেধাতিথির যজ্ঞে সন্তুষ্ট হ'য়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। যজ্ঞ শেষে ভস্মরাশি সরাবার সময় তার ভেতর থেকে একটি পরমা সুন্দরী শিশু কন্যা দেখতে পেয়ে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। এমন সময় দৈববাণী হ'ল—এই কন্যা ব্রহ্মার মানসকন্যা। পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল আদর্শ রাখবার জন্য আবার এঁর জন্ম হয়েছে।

মেধাতিথি তৎক্ষণাৎ শিশু কন্যাটিকে কোলে তুলে নিলেন এবং তার নাম রাখলেন অরুন্ধতী। অরুন্ধতী শব্দের অর্থ হলো যিনি কোন সময়েই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেন না।

মেধাতিথির আশ্রমে অসংখ্য শিষ্য ছিল। মেধাতিথি, তার পত্নী ও

সেই শিষ্যদের পরম আদর যত্নে অরুন্ধতী দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলেন।

যখন অরুন্ধতী সকল রকম স্ত্রী শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হ'লেন, তখন তার হৃদয় জ্ঞানে, করুণায়, শুচিতায় পূর্ণ হ'ল। যৌবনের পরিপূর্ণ রূপলাবণ্য তখন তার সারা দেহে ফুটে উঠলো,। সকলে দেখলেন যে তিনি একজন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। অপরূপ সুন্দরী ও সর্ব গুণন্বিতা।

অরুন্ধতী যৌবনে পদার্পণ করার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধা-তিথির আশ্রমে বশিষ্টদেব এসে উপস্থিত হ'লেন। বশিষ্টদেব প্রথম দর্শনেই অরুন্ধতীর প্রতি আসক্ত হ'লেন। অরুন্ধতীও বশিষ্টদেবকে দেখে বিচলিতা হ'লেন।

তাঁর মনে হ'ল এই মুনিই তার ইহকাল পরকালের আরাধ্য দেবতা। তিনি যেন এঁর প্রতীক্ষাতেই দিন গুনছিলেন। অরুন্ধতী তার এই ভাবান্তরের কথা ঋষি পত্নীর কাছে গিয়ে বললেন।

ঋষি পত্নী বললেন—মহর্ষি বশিষ্টদেবই এ জগতে জ্ঞানে ও ধর্মে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার ইচ্ছায় তিনিই তোমার পতি হবেন। এই মহর্ষির সেবা করেই তুমি জগতে সতীত্বের আদর্শ রেখে যাবে। তুমি চিরসতী নাম অর্জন করবে।

মেধাতিথি তাঁর আশ্রমে বশিষ্টদেবকে দেখে খুবই খুশী হ'লেন এবং তিনি তাঁর কাছে তার মেয়ে অরুন্ধতীর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

বশিষ্টদেব তাতে সম্মতি দিলেন।

মেধাতিথি দিন দেখে তাঁর বড় আদরের কন্যা অরুন্ধতীকে বশিষ্টের হাতে সমর্পণ করলেন।

বিয়ের পর স্বামী সেবাই অরুন্ধতীর ধ্যান-জ্ঞান হ'য়ে উঠলো। স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করেই তিনি ধন্য হ'লেন।

অরুন্ধতী একশত পুত্র সন্তান প্রসব করেছিলেন। পুত্রগণও তাদের পিতা-মাতার ন্যায় জ্ঞানী হ'য়েছিলেন। পুত্রদের পালন কালেও

অরুন্ধতী তাঁর স্বামীর মত ক্ষমাশীলা ছিলেন।

বিশ্বামিত্রের সাথে বিবাদে যেদিন বশিষ্ট তাঁর শত পুত্র হারিয়ে বিশ্বামিত্রকে শাপ দিতে উদ্যত হ'য়েছিলেন, সেদিন অরুন্ধতী স্বামীর ক্রোধ নিবৃত্ত করে তাঁকে ঐ মহাপাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ বা ঋষি তাদের ভগবদতুল্য শক্তির প্রভাবে কোন কোন স্থলে ব্রহ্মশাপ দিয়ে নিজেদের শক্তিক্ষয় করতে বাধ্য হ'তেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবার বহুকাল কঠোর সাধনা করে সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতেন। কিন্তু বশিষ্টদেব অরুন্ধতীকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে পেয়ে ঐরূপ পাপে কোনদিন লিপ্ত হন নি।

এ জগতে বহুকাল সংসার করার পর অরুন্ধতী স্বামীর সাথে স্বর্গারোহণ করে সপ্তর্ষি মণ্ডলে থেকে আজও আমাদের পুণ্যকর্মের জন্য আশীর্বাদ করে থাকেন।

বহু বছর আগে এই মহাসতী অরুন্ধতী আমাদের মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করেছেন কিন্তু আজও বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীকে নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে অরুন্ধতীকে চিনিয়ে দেয়। আর স্ত্রীরা সেই দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে যেন তারাও অরুন্ধতীর মত স্বামীর প্রতি অচলাভক্তি লাভ করে এবং সতীত্বের আদর্শে অম্লান রহে।

অনসূয়া

অনসূয়া হলো মহর্ষি অত্রির সহধর্মিনী। ইনিও ব্রহ্মার মানস কন্যা। এঁর মত সাধ্বী রমণী ভারতের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। একমাত্র পতি সেবাই এর জীবনের আদর্শ ছিল এবং তার দ্বারাই তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কোন এক সময় তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অনসূয়ার

সতীত্বের পরীক্ষা নেবার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মহর্ষি তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। অতএব অতিথি সংকারের ভার পড়েছিল অনসূয়ার ওপর। তিনি তাঁর সাধ্যমত এদের আপ্যায়ন করে বসালেন। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পঞ্চ ব্যাঞ্জনাদি পরিবেশন করবার জন্য এগিয়ে এলে ব্রাহ্মণগণ বললেন—আমরা তিনজন এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে—কোনও রমণী বসনদ্বারা দেহ আচ্ছাদন করে পরিবেশন করলে আমরা তার দেওয়া সে আহার্য গ্রহণ করব না।

অতিথিদের এই কথা শুনে মহাসতী অনসূয়া বিরাট সমস্যায় পড়লেন। স্বামী গৃহে নেই। ক্ষুধার্ত অতিথিগণ অনাহারে চলে গেলে গৃহস্বামীর অকল্যাণ হবে। আবার বয়স্ক পুরুষদের সামনে বিবস্ত্রা হ'য়ে বেরিয়ে খাদ্য পরিবেশন করলেও তাঁর সতীত্ব ম্লান হয়।

তিনি তখন ত্রাণকর্তা বিপদভঞ্জন সেই মধুসূদনের স্মরণাপন্ন হলেন। তিনি তাঁর নাম স্মরণ করে মন্ত্রপুত জল অতিথিদের দেহে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সতীত্বের মহিমায় অতিথিরা সদ্যজাত শিশুতে পরিণত হ'য়ে গেল। তখন এই মহাসতী তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে স্তন দান করতে লাগলেন।

এদিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী ও গৌরী তাঁদের স্বামীদের অদর্শনে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'য়ে তাঁদের স্বামীদের এই অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে তাঁদের উদ্ধারের জন্য তপস্যা সুরু করলেন। তপস্যার ফলে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের স্ব মূর্তিতেই ফেরত পেলেন।

অনসূয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দেখে তাঁর কৃত এই অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলেন।

তারা বললেন—হে মহাসতী,—আমরা তোমার পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছ। তুমি আমাদের

কাছে তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।

অনসূয়া বললেন—আপনারা যদি সত্যিই আমাকে বর দিতে চান তবে এই বর দিন যেন আমি আপনাদের মত গুণবান পুত্র লাভ করতে পারি।

—তথাস্তু। বলে দেবতারা অন্তর্হিত হ'লেন।

এই মহাসতী তারপর এঁদের পুত্ররূপে পেয়েছিলেন।

অনুসূয়ার মত আদর্শ নারী এই ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ কথা ভেবে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি।

অহল্যা

প্রাতঃস্মরণীয়া যে পাঁচজন নারী আছেন তাঁদের মধ্যে অহল্যা অন্যতমা।

অহল্যা ছিলেন মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী।

একদিন ঋষি গৌতম স্নানার্থে গমন করলে গৌতমের শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করে এসে গৌতম পত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেন। অহল্যার এতে কোনও দোষ ছিল না।

বাড়ী ফিরে গৌতম সব ব্যাপারটা জানতে পেরে পত্নীকে শাপ দেন তাঁর কৃতকর্মের জন্য।

গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণের প্রতিমায় পরিণত হয়।

অহল্যা নিষ্পাপ ছিলেন, তথাপি তাঁর স্বামী বুঝতে না পেরে তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা আবার পাষাণমুক্ত হ'য়েছিলেন।

শাপ মোচনের পর অহল্যা জগতে প্রাতঃস্মরণীয়া বলে পরিগণিত হন। স্বামী অন্যায় করলে তিনি তাঁর প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। আদর্শ ধর্মের অধিকারী সতী অহল্যা তাই ভারতের একজন প্রাতঃস্মরণীয়া নারী।

দ্রৌপদী

প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদের মধ্যে দ্রৌপদীর নাম অন্যতম।

ইনি দ্রুপদ রাজের কন্যা। অর্জুন স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করে একে লাভ করেন।

তারা তখন কৌরবদের ভয়ে ছদ্মবেশে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন।

বাড়ীতে ফিরে তারা মাকে বললেন—মা আজ একটি অদ্ভুত জিনিষ এনেছি। মা বললেন—তোমরা পাঁচজনে তা সমভাবে ভাগ করে নাও।

মায়ের আদেশে পাঁচজনেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন।

এই সতী পাঁচজন স্বামীর মনোরঞ্জন করে পরে এঁদের সাথে স্বর্গারোহণ করেন। আজীবন দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে ছিলেন। এমন কি তিনি তাঁদের সঙ্গে বনবাস, অজ্ঞাতবাস পর্যন্ত করেছেন। স্বামীর অনুগামী এমন সাধ্বী স্ত্রী নারীজাতির গৌরব।

কুন্তি

রাজা পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তিদেবীও প্রাতঃস্মরণীয়াদের মধ্যে একজন। ইনি যদু বংশীয় শূরসেনের কন্যা বসুদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাণ্ডবের জননী; এবং প্রকৃত নাম ছিল পৃথা। ইনি কুন্তিভোজ রাজার আলয়ে প্রতিপালিতা হয়েছিলেন বলে এর নাম কুন্তি।

কুমারী অবস্থায় মহর্ষি দুর্বাশা প্রাপ্ত মন্ত্রের পরীক্ষার জন্য সূর্যদেবের তপস্যা ক'রে তাঁর কাছে পুত্র কামনা করে ইনি কর্ণ নামে মহাবীর

পুত্র লাভ করেন। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুত্রকে তিনি নদীতে ভাসিয়ে দেন।

পরে পাণ্ডুরাজের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু শাপবশতঃ স্বামীর অসমর্থের জন্য তিনি ধর্ম, ইন্দ্র ও পবন দেবতার বরে মহাপরাক্রমশালী যে তিনটি পুত্র লাভ করেন, মহাভারতে তাঁরাই পাণ্ডব নামে খ্যাত। পঞ্চপুত্রের জননী বলে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিন পাণ্ডব ও কর্ণ এঁর পুত্র।

শিশুপুত্রদিগকে নিয়ে বিধবা হয়ে তিনি অতি কষ্টে তাঁদের মানুষ করেন। তাঁদের বনবাসকালে নিজেও পুত্রদিগের সঙ্গে বনবাসে যান।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ইনি ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য কুরু রমণীদের সাথে বনে গমন করে তপশ্চর্যায় দেহত্যাগ করেন। পার্থিব ভোগ-লালসার দিকে কোনদিন এঁর মন ছিল না। তিনি ছিলেন ভারতের এক আদর্শ নারী-চরিত্র।

তারা

নিত্য প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চনারীর অন্যতমা হলেন কপিরাজ বালির স্ত্রী এই তারা।

শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় মিত্র সুগ্রীবকে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তদীয় অগ্রজ বালীকে বধ করলে, এই সতী নারী শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশাপ দেন।

তারা অনার্য রমণী হ'লেও চিরদিন সতীধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাই তিনি চিরস্মরণীয়া।

মন্দোদরী

লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নী মন্দোদরীও প্রাতঃস্মরণীয়া নারীদের মধ্যে অন্যতমা।

যদিও ইনি অনার্য কন্যা তবুও সতীধর্ম অক্ষুন্ন রাখেন সারাজীবন। রামচন্দ্রের কাছ থেকে অপহৃতা সীতাকে রাবণ যতোই কষ্ট দিতে চান ইনিই পতিকে অনুরোধ করে তাঁকে রক্ষা করেন।

রাবণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র তাঁকে বর দেন যে তিনি চিরসধবা থাকবেন। তিনি তখন বললেন—আমার স্বামী ত মৃত। তখন রামচন্দ্রের বরে রাবণের চিতা আর নিভল না। তা চিরদিন ধরে জ্বলতে থাকল। মন্দোদরীও তাই বিধবা হলেন না। এইভাবে সতীত্বগৌরবে ইনি চিরসধবা রইলেন।

কৌশল্যা

কোশল রাজের কন্যা কৌশল্যা দশরথের প্রথমা স্ত্রী। এই কৌশল্যাই ছিলেন রামচন্দ্রের মাতা।

এর মত ধৈর্যশীলা ও সতীনারী জগতে বিরল। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও ইনি কখনও ধৈর্য হারাননি বা কাউকে অভিসম্পাত করেন নি।

সব কষ্ট, সব দুঃখের মূল কে তা জেনেও ইনি নীরবে যত দুঃখ মেনে নিয়েছেন।

রামায়ণ মহাকাব্যে ইনি একজন আদর্শ রমণী।

উত্তরা

বিরাট রাজ দুহিতা উত্তরা। তিনি অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর পত্নী।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথী দ্বারা অভিমন্যু যখন অন্যায়ভাবে নিহত হলেন, তখন এঁর গর্ভে পরীক্ষিত ছিলেন বলেই তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পারেন নি।

রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হ'লো। উত্তরা তপশ্চর্যায় দেহত্যাগ করেন।

উত্তরার বীরত্ব ও সতীত্ব অনুকরণীয়। মহাভারতে তাঁর চরিত্র একটি সত্যিকারের ঘরণীর চরিত্র।

গান্ধারী

গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা হলেন গান্ধারী। ভীষ্মদেবের কাছ থেকে যখন বিয়ের সম্বন্ধ আসে ধৃতরাষ্ট্রের জন্য তখন গান্ধারীর পিতা রাজী হন না।

কারণ জেনে শুনে জন্মান্ধকে কে মেয়ে দিতে চায়? কিন্তু গান্ধারী বুঝতে পারলেন যে ভীষ্মের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। তিনি তাই অন্ধ জেনেও ধৃতরাষ্ট্রকে বিয়ে করেন এবং স্বামী অন্ধ ছিলেন বলে তিনি নিজে সব সময় চোখে কাপড় বেঁধে থাকতেন। স্বামীর প্রতি এমন ভক্তি ক'টি নারীর থাকে?

তিনি শতপুত্রের জননী হ'য়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের তিনি সবসময় সৎপথে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতেন।

রাজাকে তিনি বলতেন—তুমি ওদের শাসন কর। কিন্তু রাজা পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে তা পারতেন না।

শতপুত্রকে হারিয়েও তিনি কখনও অধর্ম করেন নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এলে গান্ধারী বললেন—ধর্মের জয় হোক! ধর্মের প্রতি এমনি ছিল তাঁর অচলা ভক্তি! এর জন্যে পুত্রদের তিনি হারাতেও দ্বিধা করেন নি।

গোপা

ভগবান বুদ্ধের স্ত্রী গোপাদেবী ছিলেন কলিঙ্গ দেশের রাজা দণ্ডপানির কন্যা।

গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্মশীলা নারী ছিলেন। পুত্র রাহুলের জন্মের সপ্তদিবস পরে স্বামী ধর্মার্থে গৃহত্যাগ করলে গোপা সাত বৎসর ধরে স্বামীর চিন্তায় কালাতিপাত করেন। এমন পতিভক্তি সত্যিই বিরল।

সাত বছর পরে ভিক্ষুবেশে স্বামী ঘরে ফিরলে গোপা ভিক্ষুনী হ'য়ে স্বামীর ধর্মজীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক করে তোলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের আদর্শ। এমন আদর্শ পত্নী এই ভারতের বুকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

গার্গী

ত্রেতাযুগে চিরকুমারী ব্রহ্মবাদিনী নারী গার্গী রাজর্ষি জনকের রাজসভায় নিঃশব্দচিত্তে যাজ্ঞবল্ক ইত্যাদি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে নিজের অবিনশ্বর কীর্তি রেখে গিয়েছেন। তিনি আর কেউই নন, ভারতের নারী প্রতিভার উজ্জ্বল আদর্শ নারী গার্গী। এঁর তেজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিদুষী নারীদের মধ্যে তিনি একটি আদর্শ চরিত্র।

প্রমীলা

লঙ্কার রাজা ত্রিভুবন বিজয়ী দশাননের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ মেঘনাদের স্ত্রী প্রমিলা। ইন্দ্র বিজয়ী বীর মেঘনাদের ইনি উপযুক্তা বীরপত্নী ছিলেন। অসামান্যা সুন্দরী এই রাক্ষস কুলবধূর সতীত্বে ও তেজস্বিতায় স্বয়ং দেবী ভগবতী পরিতুষ্টা ছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্র এই সতী নারীর তেজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের হাতে স্বামী নিহত হ'লে প্রমিলা সহমরণে দেহত্যাগ করেন।

মৈত্রেয়ী

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয়া পত্নী মৈত্রেয়ী ; প্রথমা কাত্যায়নী।

মহর্ষি সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উভয় পত্নীর কাছে যখন অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই সময়ে মৈত্রেয়ী ইহলোকের সর্বসুখ বর্জন করে স্বামীর অনুগামিনী হন এবং তাঁর আধ্যাত্ম জীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্জ্বল ও সার্থক করে তোলেন। তিনি বলেন—'যে নাহং নামৃতাখ্যাম্ তে নাহং কিং করোমি ?' অমৃতের প্রতি এমন আকর্ষণ এই ভারতের নারীর পক্ষেই সম্ভব।

যশোদা

ব্রজরাজ নন্দ ঘোষের পুণ্যবতী পত্নী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদাই যশোমতী নামে পরিচিতা।

সতীসাধ্বী যশোমতী স্ত্রী সুলভ বহু সদ্‌গুণে বিভূষিতা ছিলেন। বাৎসল্য-রসের এমন করুণাময়ী মূর্তি জগতে আর দ্বিতীয় নেই বললেই চলে। তাঁর মাতৃস্নেহে ভগবান তৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখগহ্বরে মাতাকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়ে কৃতার্থ করেন।

বাৎসল্য-স্নেহের বশেই তিনি মুনিঋষিদেরও আদর্শনীয় বিশ্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বেহুলা

বেহুলা ছিলেন নিছনি নগরের সায়-সওদাগরের মেয়ে।

রূপে, গুণে, বেহুলার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন সমস্ত গুণের আধার।

চম্পক নগরের সওদাগর চাঁদ সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিয়ে হয়।

মনসা দেবীর সাথে চাঁদ সওদাগরের খুব বৈরী ভাব ছিল।

মনসা দেবীর পূজা স্বয়ং চাঁদ সওদাগর না করলে মর্ত্যে মনসা দেবীর পূজা প্রচলিত হবে না—তাই যাতে চাঁদ সওদাগর মনসা পূজা করে এইজন্যে মনসা দেবী একে একে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটালেন।

সর্পাঘাতে একে একে চাঁদ সওদাগরের ছয় ছেলে মারা গেল তবুও তিনি মনসা পূজা করলেন না।

তার চৌদ্দ ডিঙ্গা জলমগ্ন হ'ল—তার স্ত্রী কত অনুরোধ করলেন কিন্তু তবুও তিনি মনসা পূজা করলেন না। তিনি অচল অটল।

অবশেষে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি লোহার বাসরে আবদ্ধ করে রাখলেন। কিন্তু মনসা দেবীর হাত থেকে তবুও নিস্তার পেলেন না ছোট ছেলে লক্ষ্মীন্দর।

রাতেই সর্প দংশনে তার মৃত্যু হ'ল।

কলার ভেলাতে করে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল লক্ষ্মীন্দরকে। সতী বেহুলাও স্বামীর সঙ্গে ভেসে চললেন। তিনি তাঁর শ্বশুর শাশুড়ীদের বলে গেলেন যে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে তিনি আর কোনও দিনই ফিরবেন না।

তিনি পথে যেতে যেতে নানা বিপদের সম্মুখীন হ'য়েছিলেন।

দীর্ঘদিন পরে তিনি যখন শিবলোকে গিয়ে পৌঁছলেন তখন লক্ষীন্দরের হাড় ক'খানি মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দেবতারা তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধনে সন্তুষ্ট হলেন।

মহাদেবের আদেশে মা মনসা দেবী তখন লক্ষীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিয়ে দিলেন তার ছয় ভাইকে। চৌদ্দ ডিঙ্গাও জলের উপর দিয়ে ভেসে উঠল।

মৃত স্বামী, ভাসুর ও ডিঙ্গাগুলি নিয়ে দেশে ফিরে আসবার পর সারাদেশে বেহুলার জয় জয়াকার পড়ে গেল।

চাঁদ সওদাগর বেহুলার মুখে সব শুনে মা মনসার উপর খুশী হলেন এবং মহাসমারোহে মা মনসার পূজা করলেন।

মৃত্যুর পরে বেহুলা ও লক্ষীন্দর দেহত্যাগ করে দিব্যরথে চড়ে স্বর্গারোহণ করলেন।

বেহুলা সত্যিই সতী নারীর আদর্শ।

চিন্তা

গন্ধর্বরাজ চিত্ররসের পুত্র মহারাজ শ্রীবৎসের কোন গুণের তুলনা ছিল না। বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও পাণ্ডিত্যে তাঁর তুলনা ছিল না। যথাসময়ে চিত্র সেনের কন্যা চিন্তার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল। যোগ্যের সাথে যোগ্যার বিয়ে হ'ল। বেশ কিছুদিন দু'জনে সুখে কালাতিপাত করলেন। কিন্তু সবদিন সকলের সমান থাকে না। অবশেষে একদিন ঘনিয়ে এল বিষাদের কালো ছায়া।

একদিন রাজসভায় লক্ষীদেবী ও শনি দু'জনে এসে শ্রীবৎসের কাছে বিচার চাইলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে বড় ?

রাজা শ্রীবৎস শনিকে ছোট করে লক্ষীদেবীকেই বড় বললেন। ফলে তিনি শনির কোপে পড়ে গেলেন।

শনির চক্রান্তে রাজ্যধন সব হারিয়ে তাঁকে পথে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। তিনি চিন্তাকে বাপের বাড়ী পাঠাতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু চিন্তা স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করলেন না।

শনি চাক্রান্ত করে তাদের একখানা কাপড় চুরি করলেন। কিন্তু তবুও চিন্তা রাজাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন না। শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও পতীর সাথে চলতে লাগলেন।

একদিন শ্রীবৎস রাজা একটি ধীবরের কাছ থেকে শোল মাছ আনলেন খাবার জন্য। চিন্তা তা পুড়িয়ে নিয়ে জলে ধুতে গেলে সেই পোড়া শোল মাছ জলের ভেতর অন্তর্ধান করল।

আর একদিন একটা চড়ায় একখানা নৌকা এসে লাগল। নৌকা কিছুতেই নড়ে না। অবশেষে ঠিক হ'ল কোন সতী নারী যদি নৌকাটা স্পর্শ করে তার নৌকা চলবে। একে একে সব ধীবর রমণীরা সেখানে এসে নৌকা স্পর্শ করল, কিন্তু নৌকা নড়ল না। শেষে চিন্তা সেই নৌকা স্পর্শ করতেই নৌকা চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু দুষ্ট সওদাগরেরা চিন্তাকে হরণ করে নিয়ে গেল।

এরপর শ্রীবৎস রাজা আরও কিছুদিন কর্মভোগ করে একদিন সুবাহু রাজার দেশে এসে উপস্থিত হলেন।

ঐ দিন সুবাহু রাজার কন্যা ভদ্রার স্বয়ংবর ছিল। তিনি শ্রীবৎসকে পতিত্বে বরণ করেন। আর ঠিক ঐ দিনই সেই দেশে ঐ সওদাগররা ব্যবসা করতে এলেন এবং শ্রীবৎসরে সাথে মিলিত হলেন চিন্তা।

শুভদিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে নিয়ে শ্রীবৎস নিজের রাজ্য দিয়ে এলেন। সতীর প্রভায় রাজ্য আবার সুখৈশর্যে ভরে উঠল। চিন্তা সতীত্বের আদর্শ এক অপরূপ নারী চরিত্র।

শকুন্তলা

ব্রাহ্মণ হবার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তা দেখে ভীত হ'য়ে দেবতারা স্বর্গের অপ্সরী মেনকাকে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য পাঠালেন।

মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বমিত্র তাঁকে বিয়ে করলেন। ফলে মেনকার গর্ভে তাঁর ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা সদ্যপ্রসূত সেই কন্যাকে ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র কন্যাটিকে গ্রহণ না করে তাকে একটি বনে ফেলে দিয়ে এলেন। বনের ভেতর পাখীদের মাঝখানে সেই কন্যাকে কুড়িয়ে পেল কণ্ব মুনির আশ্রমের ঋষি কুমারগণ।

কণ্বের আশ্রমে ও মা গৌতমীর স্নেহ ছায়াতলে লালিত পালিত হ'য়ে উঠলেন শকুন্তলা।

একদিন ঋষি বাইরে গেছেন এমন সময় মহারাজ দুষ্মন্ত সেই বনে মৃগয়া করতে এসে শকুন্তলার রূপে মোহিত হলেন এবং তাকে একটি আংটি দিয়ে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করলেন।

বিয়ের সাক্ষী স্বরূপ ঐ আংটিটাকে রেখে তিনি দেশে ফিরে গেলেন।

একদিন শকুন্তলা আনমনা হ'য়ে দুষ্মন্তের চিন্তা করছিলেন এমন সময় সেখানে এলেন মুনি দুর্বাসা। এসে বার কয়েক ডেকে শকুন্তলার তন্ময়তা যখন ঘোচাতে সমর্থ হ'লেন না তখন তাকে অভিশাপ দিলেন যে, যার-ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে তুই আমাকে অবহেলা করলি সে তোকে চিনতে পারবে না।

সে অভিশাপের কথা শকুন্তলা শুনতে পেলেন না।

কণ্ব মুনি এসে সব শুনে শকুন্তলাকে পতি গৃহে পাঠালেন। কিন্তু দুর্বাসা মুনির শাপ ব্যর্থ হবার নয়। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। কারণ ওদের বিয়ের সাক্ষী হাতের সেই আংটিটা শকুন্তলা হারিয়ে ফেলেন।

পিতৃগৃহে আবার ফিরে আসেন শকুন্তলা।

এর পরে সেই আংটি পেয়ে রাজার আবার শকুন্তলার কথা মনে পড়ল। তিনি তখন তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন তার একটি সন্তান হ'য়েছে। তার নাম ছিল ভরত। এই ভরতের নাম অনুসারেই এই রাজ্যের নাম ভারত হ'য়েছিল।

শকুন্তলা ভারত ইতিহাসের একটি আদর্শ নারীচরিত।

বীর রাণী ভবশংকরী

মেয়েটার বয়স তেরো চৌদ্দ বছর এর বেশী নয়। কিন্তু এইটুকু বয়সেই তলোয়ার খেলা, ধনুকছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া সব কিছুতেই সে ওস্তাদ হয়েছে।

এমনকি বড় বড় ছেলেরাও তার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে হেরে যায়।

তার হাতের ধনুক থেকে ছোঁড়া তীর ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে বেঁধে। সেদিন মেয়েটি তার দুজন সঙ্গিনীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে একটা বন্য মহিষকে অনুসরণ করেছিল।

মহিষটি প্রাণপণে ছুটছিল। মেয়েটাও ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে অনুসরণ করছিল।

কিছু সময়ের মধ্যেই মেয়েটা বর্শা ছুঁড়ল মহিষের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে মহিষটি মারা গেল।

সেই সময় নদীর ওপর দিয়ে চলেছিল এক সুন্দর নৌকা। তাতে ছিলেন ভূরসুটের রাজা রুদ্রনারায়ণ। তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এই দৃশ্য দেখে।

একটা সাধারণ মেয়ে যে এত সাহসী ও কুশলী হতে পারে এ ছিল তাঁর ধারণার বাইরে।

মেয়েটির সাহস দেখে তিনি হলেন মুগ্ধ।

খোঁজ নিয়ে জানলেন সে গ্রামের জমিদারের মেয়ে।

মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য তিনি ঘটক পাঠালেন।

ঘটক ফিরে এলো। বীরত্বের উপযুক্ত পরিচয় না পেলে সে মেয়ে কোনও ছেলেকে বিয়ে সে করবে না।

রুদ্রনারায়ণ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।

তাঁকে বলা হল এককোপে একটা মহিষের গলা কেটে ফেলতে হবে,

রুদ্রনারায়ণ হেসে একসঙ্গে এককোপে কেটে ফেললেন, একটা মোষের সঙ্গে আর একটা পাঁঠাকেও।

বীরাঙ্গনা ভবশংকরী রুদ্রনারায়ণের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

বিয়ের কয়েক বছর পর রুদ্রনারায়ণ মারা গেলেন হঠাৎ।

ভবশংকরী হলেন ভূরসুটের রাণী।

সে আমলে তাঁর পাশের রাজ্যের মালিক ছিলেন পাঠান—ওসমান খাঁ। তিনি সামান্য নারীর হাত থেকে ভূরসুট জয় করতে চললেন, বিরাট সৈন্যদল নিয়ে।

আগে থাকতে সব জানতেন রাণী। তাঁর সৈন্যদলও তাই প্রস্তুত হয়েই ছিল।

ওসমান খাঁ ভবশংকরীর বিপুল সৈন্যসামন্ত দেখে বিস্মিত হলেন।

বিরাট মাঠ। ওসমান এগিয়ে গেলেন তার মাঝ দিয়ে ভূরসুট আক্রমণ করতে। রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

আশ্চর্য্য হলেন ওসমান। কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে তাঁর সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করছে।

চারিদিকে তাকিয়ে ওসমান দেখলেন যে সার সার গাছের পাশ থেকেই আসছে তীর।

এর মাঝে হাজার খানেক পাঠান মারা পড়ল।

এর পরও এগোতে লাগল পাঠান সৈন্য—তীর উপেক্ষা করে।

গাছের কাছে এগোলে গাছগুলি আপনা হতে পড়ে যেতে লাগল।

আর এক এক গাছের পরিবর্তে এক একটা সৈন্য বেরিয়ে এল।

প্রচুর পাঠান মারা গেল।

ওসমান খাঁ পরাজিত হলেন।

সামান্যা নারীর কাছে পরাজিত হয়ে ওসমান খাঁ পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

রাণী রোজ যান মন্দিরে পূজা করতে মাত্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে।

ওসমান এই সুযোগ নিলেন।

মনে মনে জয়ের জন্য তিনি নিশ্চিন্তই ছিলেন।

রাণীকে হঠাৎ পথের মধ্যে আক্রমণ করলেন।

রাণীর সঙ্গে থাকত এক বড় শাঁখ। নিয়ম ছিল ঐ শাঁখের শব্দ শুনলেই সৈন্যদল সব ছুটে আসবে।

দূর থেকেই ওসমানকে দেখতে পেয়ে গেল রাণীর রক্ষীরা।

শাঁখ বাজল। রাণীর সৈন্যরা ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে।

হাতীতে চড়ে বর্শা নিয়ে রাণী প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন।

ওসমানের অনেক সৈন্য মারা পড়ল।

শেষে স্বয়ং ওসমান পরাজিত হয়ে নিহত হলেন।

এরপর আর রাণীর রাজ্য কেউই আক্রমণ করেনি।

মোগল সম্রাট আকবরের আদেশে একবার তাঁর সৈন্যদল এলো বাংলায়।

উদ্দেশ্য—পাঠান দমন।

এসে তারা দেখল যে আগে থেকেই রাণী পাঠানদের শায়েস্তা করেছেন।

এ সংবাদ পৌঁছল সম্রাট আকবরের কাছে। চমৎকৃত হলেন আকবর।

গুণীজনের প্রকৃত সম্মান তিনি করতে জানতেন।

সামান্য বিধবা নারীর এই বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আকবর তাঁকে রায়বাঘিণী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

ভবশংকরী হলেন রায় বাঘিণী। আজও বাংলার দেশে প্রবাদ বাক্য এটা—কোন বীরত্বপূর্ণ নারীচরিত্রকে বাঙালীরা বলে রায়বাঘিণী। ধন্য রাণী ভবশংকরী। এমন বীর নারী এই বাংলার মাটিতেই জন্ম নিয়েছিলেন ভেবে আমরা গর্ব অনুভব করি।

রাণী ভবানী

রাজসাহী জেলার ছাতিনা গ্রামে থাকতেন আত্মারাম চৌধুরী। অবস্থা তাঁর ভালই ছিল।

বাড়ীতে অতিথি এলে বা দীনদুঃখী এলে তাকে উপযুক্ত ভাবেই সম্বর্ধনা করতেন আত্মারাম।

আত্মারামের একটা মেয়ে ছিল। পরমাসুন্দরী সে। যেন চাঁদের কণা।

শুধু রূপ নয় অসামান্যা দয়াবতীও সে।

বাড়ীতে দুঃখী ভিখারী এলে আগে সেই ছুটে যায়। ভিক্ষা দেয় তাকে। অতটুকু মেয়েকে তারা বলে অন্নপূর্ণা। প্রাণভরে আশীর্বাদ করে তারা তাদের অন্নপূর্ণাকে।

নাম কিন্তু তার অন্নপূর্ণা নয়। নাম তার ভবানী।

ধীরে ধীরে বড় হয় ভবানী। রূপে গুণে অতুলনীয়া। তার কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। একদিন সেকথা পৌঁছোয় নাটোরের রাজা রামজীবনের কানে।

রাজা রামজীবন ঠিক করলেন এই মেয়েকেই তিনি তাঁর ছেলের বৌ করবেন।

রাজা রামজীবনের পুরানো কর্মচারী ছিলেন দয়ারাম। কর্মচারী হলেও রাজা তাকে খুব ভালবাসতেন। সব কাজেই ডাক পড়ে দয়ারামের। তাকে না জিজ্ঞাসা করে, রাজা রামজীবন কিছুই করেন না কখনও।

ছেলের বিয়ের পাত্রী ঠিক করতে রাজা রামজীবন দয়ারামকে পাঠালেন ছাতিনাতে।

দয়ারাম এসে ভবানীকে দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেদিনই তিনি বিয়ের সম্বন্ধের সব পাকা কথা বলে ভবানীকে আশীর্বাদ করলেন।

শুভদিনে ভবানী রামকান্তের বৌ হয়ে নাটোরে এলেন।

পরে রামজীবন মারা গেলেন। রামকান্ত হলেন নাটোরের রাজা আর রাণী হলেন ভবানী।

রাজা হয়ে কিন্তু রামকান্ত বড়ই অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। দয়ারামের মত যোগ্য লোককেও তিনি অপমান করলেন একদিন!

দয়ারাম সব কথা বাংলার নবাব আলিবর্দীকে জানালেন।

আলীবর্দী রামকান্তকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলেন। রাজা করলেন দেবীপ্রসাদকে। রাজ্যচ্যুত রামকান্ত ভবানীকে নিয়ে চলে এলেন মুর্শীদাবাদ।

ইতিমধ্যে একদিন পথে দয়ারামের সঙ্গে তাদের দেখা হল।

রাণী আছেন অতি সাধারণ ভাবে। তাঁর মুখের হাসি কিন্তু অম্লান।

দয়ারামের কাছে রামকান্ত কেঁদে পড়লেন।

দয়ারাম.এখন নিরুপায়। তবে উপায় একটা আছে, বললেন তিনি।

পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যবস্থা হলে নবাবের অনুচরদের কাউকে হাত করে একটা ব্যবস্থা হয়ত করা যায়। কিন্তু অত টাকা কোথায়?

রাজার কল্যাণের জন্য রাণী গায়ের সব গয়না খুলে দিলেন নিঃস্ব রামকান্তকে। সেগুলি বিক্রি করে প্রচুর উপহার নিয়ে দয়ারাম দেখা করলেন নবাবের সঙ্গে।

এদিকে দেবীপ্রসাদও খুব অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। প্রজারা অতিষ্ঠ। নবাব সে খবরও পেলেন।

এই সময়ই দয়ারাম রামকান্তকে নিয়ে নবাবের কাছে এসে তাঁকে

সব কথা খুলে বললেন। নবাব সব শুনে কাগজপত্র দেখে রামকান্তকে নাটোরের জমিদারীর প্রকৃত মালিক বলে মেনে নিলেন।

দেবীপ্রসাদকে দিলেন তাড়িয়ে। রামকান্ত আবার রাজা হলেন।

অল্পদিন পরেই রাণী বিধবা হলেন। সামান্য মাত্র ভুগে সংসারের মায়া কাটালেন রামকান্ত।

রাণীর দুটি ছেলেও আগেই মারা গেছেন। আছে একটা মেয়ে—নাম তারাসুন্দরী।

বিধবা হয়ে রাণীর কাছে জগৎ শূন্য বোধ হল। রাণী বুঝলেন, সংসার দুদিনের। কেউ কারও নয়।

যার জন্য লোকের এত কাড়াকাড়ি মারামারি সেই ধনদৌলতও কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। শোকে মুহ্যমান হলেন রাণী। কিন্তু কর্তব্য তিনি ভুললেন না। কর্তব্যে অচলা রইলেন রাণী ভবানী।

একটি ছেলে—নাম তার রামকৃষ্ণ—তাকে রাণী পোষ্য নিলেন। কারণ রাজ্যের ভবিষ্যৎও ভাবা চাই।

রাজ্য চালাতে লাগলেন রাণী। প্রজাদের কল্যাণে তিনি উৎসর্গ করতে চাইলেন নিজের জীবন।

রাজ্যের দিকে দিকে অন্নসত্র খোলা হল।

সারা দিনরাত রান্না হত সেখানে। যে যখনই আসুক না কেন, ফিরে যেত না।

রাজ্যের প্রজাদের বড় জলকষ্ট। সংবাদ পেয়ে রাণী উতলা হলেন।

রাজ্যের স্থানে স্থানে দীঘি, পুকুর কাটালেন। জলকষ্ট দূর করতে তৎপর হলেন। প্রজারা জলকষ্ট থেকে মুক্তি পেল।

প্রাণ খুলে রাণীর জয় দিল তারা।

প্রজাদের বড় রোগকষ্ট। প্রায়ই তারা নানারকম রোগব্যাধিতে ভোগে। এর প্রতিকার করতে চাইলেন রাণী।

আট জন কবিরাজকে নিয়োগ করলেন রাণী।

এরা মাসে মাসে মাহিনা পেতেন রাজ্য থেকে।

তাঁদের কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগগ্রস্ত প্রজাদের চিকিৎসা করা। তাদের শারীরিক উন্নতি বিধান করা।

এসব করে রাণী মনে সুখ পেলেন।

দুর্গা পূজার সময় তিনি প্রত্যেক বছরে হাজার হাজার সধবা ও কুমারী মেয়েদের কাপড় কিনে দিতেন। তাদের সেবা করে তিনি নিজে ধন্য হতেন। মনে শান্তি পেতেন।

তাছাড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের উপযুক্ত বিদায় সেবার ব্যবস্থাও ছিল। রাণী এর পরিমাণ বরাদ্দ করলেন—পঞ্চাশ হাজার টাকা।

রাণী সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন।

সব সময় তিনি প্রজাদের নিজের হাতে দান করতে পারতেন না—তাই তিনি নিয়ম করলেন যে একশো টাকা পর্যন্ত দান, দেওয়ান রাণীকে না জানিয়ে নিজেই করতে পারবেন। তার বেশী হলে রাণীকে জানাতে হবে।

হাজার হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিঘে বিঘে জমি রাণী দান করতে লাগলেন। এখনও তাদের বংশধররা সেইসব জমি ভোগ করছে।

রাণীকেও সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে তারা।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের জয় হল। পরাজিত হল নবাব সিরাজ।

কোম্পানীর সময় একবার ভাল করে খাজনা আদায় হলো না।

কয়েক লক্ষ টাকা বাকী পড়ল।

এদেশের খাজনা তখন আদায় করতেন—শোর সাহেব।

তিনি মতলব করলেন—রাণীর জমিদারী কেড়ে নিয়ে তাকে ভাগ ভাগ করে বিক্রী করবেন। এতে খাজনা মিটবে। কিছু মোটা লাভও থাকবে সাহেবের।

এমন সময় একদিন রাতে ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন— স্বয়ং মা-কালী তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে।

দেবী উগ্রভঙ্গিতে বলছেন—তুই যদি রাণীর জমিতে হাত দিস, তাহলে তোকে কেটে ফেলব। ভয়ে আঁতকে উঠলেন সাহেব। সংকল্প ত্যাগ করলেন।

তারপর আর তিনি কখনও রাণীর জমিতে হাত দেননি।

শেষ বয়সে রাণী গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য এলেন বরাহনগরে। গঙ্গা-তীরেই পুণ্যবতী দেহরক্ষা করলেন।

প্রায় দেড়শো বছর আগে রাণী স্বর্গারোহণ করেছেন। তবু আজও এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে স্মরণ করে। নিজেরা ধন্য হয় তাঁর দয়ার কথা বলে। তিনি অমর। চিরকাল লোকে তাঁর কথা স্মরণ করবে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

রাণী রাসমণি

ছোট্ট মেয়েটা।

খুব ছেলে বেলায় তার মা মারা গেছে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। যে দেখে সেই তাকে ভালবাসে। বাবা আর পিসির যত্নেই বড় হতে থাকে সে।

প্রতিবেশীদের একটি মেয়ের অসুখ করেছে। মেয়েটি তার সই। সইকে সে খুব ভালবাসে।

সইয়ের অসুখ চলেছে খুবই খারাপের দিকে। বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। মেয়েটি সইয়ের মাথার কাছে বসে এক মনে রাম নাম জপ করে। দুচোখ দিয়ে তার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে রামায়ণে পড়া শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। শ্রীরামচন্দ্র যেন তাঁর পা ঠেকিয়ে পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করছেন।

মেয়েটি তখন রামচন্দ্রের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। আকুল প্রার্থনা জানায়—হে রাম, হে প্রভু, তুমি তো জগতের সবার দুঃখ দূর কর। আমার সখীকে তুমি ভাল করে দাও। আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে ওকে ভাল কর।

ধীরে ধীরে যেন শূন্যে মিলিয়ে যান—রামচন্দ্র।

একটু পরেই সখী উঠে বসে।

মেয়েটি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে জ্বর নেই আর। গায়ের উত্তাপ স্বাভাবিক। রোগের কোন যন্ত্রণাই নেই। আশ্চর্য্য হয়ে যায় বাড়ীর সকলে।

সত্যিই এরকম কাণ্ড জীবনে তারা দেখেনি। সব শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যায় তারা। বলে—এ মেয়ে মানুষ নয়—দেবতা।

—কিছুদিন পরে ধনী রাজচন্দ্রের সঙ্গে হোলো তার বিয়ে।

নতুন বৌ দেখতে বাড়ীতে খুব ভিড় হল। হৈ চৈ আর আনন্দ কলরব সব ছাপিয়ে সকলের মুখে এককথা—এ মেয়ে রাজরাণীই বটে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর সবাই তার ওপর খুশী।

ইতিমধ্যে আবার ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

সেদিন ফুলশয্যার রাত।

মেয়েটিকে সাজান হয়েছে ফুল দিয়ে।

হঠাৎ এক সাধু এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।

একে রাত্রি, তাতে আবার অন্দর মহল। হঠাৎ সাধুর আবির্ভাবে

সবাই চমকে উঠলেন। দারোয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে কি করে সাধু যে অন্দর মহলে এলেন—তা কেউ ভেবে পায় না।

সাধুর কিন্তু কোন দিকেই দৃষ্টি নেই। সোজা এসে তিনি মেয়েটিকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর তার হাতে দিলেন একটি ছোট্ট শ্রীরঘুনাথের মূর্তি। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মেয়েটি সেই বিগ্রহটিকে বাড়ীতে এনে নিয়মিতভাবে পূজার্চনা করতে লাগলেন।

এতক্ষণ ধরে যে ভক্তিমতী মেয়েটির কথা বলা হল—তিনিই হচ্ছেন স্বনামধন্যা রাণী রাসমণি।

আজও বাংলার প্রতিটি ঘরে লোকে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

মানুষের মনে তিনি অমর হয়ে চিরদিন বিরাজ করবেন।

রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র ছিলেন একধারে বিদ্বান, সৎচরিত্র, দাতা ও সদালাপী। বিপদে তার কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ বিমুখ হতো না। রাসমণির কোনো ছেলে ছিল না। তাঁর চার মেয়ে।

পদ্মমণি, কুমারী, করুণা আর জগদম্বা।

বড় ও মেজ মেয়ের বিয়ে ভাল ঘরে হয়েছিল। তবে বিদ্যাবুদ্ধিতে কিন্তু তারা খুব উঁচু ছিলেন না। কিন্তু তৃতীয় মেয়ে করুণার স্বামী ছিলেন সবদিকেই উপযুক্ত। নাম তাঁর মথুরামোহন।

রাসমণির এ সুখ কিন্তু বেশীদিন সইল না। পরপর দুটি শোক পেলেন তিনি। স্বামী ও তৃতীয় মেয়ে করুণাময়ী মারা গেলেন।

মথুরামোহন ছিলেন ঘর জামাই।

করুণাময়ী মারা যাবার পর তিনিও চলে যেতে চাইলেন।

রাণীর ছোট মেয়ের তখনও বিয়ে হয়নি।

জগদম্বার সঙ্গে আবার বিয়ে হলো মথুরামোহনের।

এদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদারী চালনা করা নিয়ে রাণী বড় বিপদে পড়লেন।

সব শোক দুঃখ মুছে তিনি নিজের হাতে নিলেন জমিদারী পরিচালনার ভার। সবকিছু খুঁটিনাটি তিনিই দেখতেন।

মথুরামোহন তাঁকে এসব ব্যাপারে খুবই সাহায্য করতেন।

রাসমণি গরীবের ঘরে জন্মেছিলেন। তাই গরীবের দুঃখ তিনি কখনও ভোলেন নি। দুঃখীরা তার সাহায্য পেয়েছে সবসময়।

সে সময় জেলেরা গঙ্গায় মাছ ধরত। কোনো খাজনা তারা দিতে না। একবার ইংরাজ সরকার তাদের উপর কর চাপিয়ে দিল। গরীব জেলে—এমনিতেই খেতে পায় না। তারা খাজনা দেবে কি করে ?

যা হোক এসে তারা ধর্ণা দিল রাণীর কাছে। বিপদে তারা সাহায্য চাইল।

তখন রাণী গঙ্গা ইজারা নিলেন ইংরাজদের কাছ থেকে।

গঙ্গার সীমানা বরাবর তিনি এক লোহার শেকল টেনে দিলেন। এতে ষ্টীমার, লঞ্চ্ ইত্যাদি চলা বন্ধ হলো। ইংরাজরা ব্যস্ত হয়ে এসে রাণীকে তারা অনুরোধ করল চেন তুলে নিতে।

রাণী নারাজ। বললেন এত টাকা দিয়ে তিনি ইজারা নিয়েছেন, তাঁর মাছ দরকার। ষ্টীমার লঞ্চ গেলে তার শব্দে মাছ পালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং শেকল তিনি তুলবেন না।

ইংরাজরা জেলেদের কর তুলে নিল। রাণীর টাকা ফিরিয়ে দিল।

এই ঘটনা থেকে রাণীর দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটল, যাতে রাণী বুঝতে পারলেন যে এবার তাঁর শক্তিপূজা করার সময় হয়েছে। রঘুনাথ বিগ্রহ গেলেন হারিয়ে। কেউ পেল না তাকে খুঁজে। রাণীর মনে হলো রঘুনাথ নিজেই চলে গেছেন।

এদিকে একদিন কয়জন মাতাল গোরা সৈন্য একদিন রাণীর জানবাজারের বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। সকলের হাতেই বন্দুক।

লাঠিয়ালদের হারিয়ে দিয়ে তারা অন্দরের দিকে আসতে লাগল।

ব্যাপার খারাপ বুঝে রাণী এগিয়ে গেলেন। সিংহবাহিনীর মত হাতে খাঁড়া নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর রণচণ্ডী মূর্তি দেখে গোরারা থমকে দাঁড়াল।

এমন সময় এলেন তাঁদের 'ওপরওয়ালা।

লজ্জায় গোরারা চলে গেল নতমুখে।

এই সময় ঘটল আর এক ঘটনা

দুর্গাপূজার সময় বাজনদাররা ঢাকঢোল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল কলাবৌকে স্নান করাতে—সপ্তমীর দিনে। পথে এক মাতাল ইংরাজ রুখে দাঁড়াল। হাতে তার বন্দুক। বলল—ঢাক বাজালে গুলি চালাবে সে।

রাণী সংবাদ পেয়ে মথুরামোহনকে লাঠিয়াল নিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে বললেন। যেমন করেই হোক না কেন কলাবৌকে স্নান করিয়ে আনতেই হবে! লাঠিয়ালদের বীরত্বে হার মানল মাতাল সাহেব। চুপ করে রইল সে।

খুব ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মথুরামোহন কলাবৌ স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন।

এদিকে সাহেব শুরু করল এক ফৌজদারী মামলা। আদালতে মথুরামোহনের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হল। রাণী এ অপমান সহ্য করলেন না। হাইকোর্টে যাবার পথটা ছিল রাণীর সম্পত্তি। তিনি বেড়া দিলেন। পথ বন্ধ হয়ে গেল। পথ বন্ধ হওয়ায় জজ, ব্যারিষ্টারদের কোর্টে যাবার পথ বন্ধ হল।

চারিদিকে সুরু হল ভয়ানক বিশৃঙ্খলা।

সরকার রাণীর সঙ্গে মিটমাট করতে চাইলেন।

রাণী বললেন, আমার জমিতে আমার খুশীমত আমি রাস্তা করেছি; বন্ধও করব আমারই খুশীমত। তাতে অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে আমি তাকাব না। ফলে সরকার থেকে মাপ চাওয়া হল। জরিমানার টাকাও ফেরৎ দেওয়া হল।

রাণী রাস্তার বেড়া তুলে দিলেন।

রাণীর সবচেয়ে বড় কাজ হলো দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা।

একবার স্বপ্নাদেশ পেলেন তিনি। দ্বাদশ শিব, কালী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্র'তষ্ঠার আদেশ পেলেন। তারপর থেকেই তিনি গঙ্গার ধারে উপযুক্ত জমির খোঁজে ছিলেন। শেষে দক্ষিণেশ্বরের জমি পছন্দ হল।

প্রতিষ্ঠা হল মন্দির আর বিগ্রহ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতেই সাধনা করে সিদ্ধ হন। মন্দিরের সেবাচর্চায় যাতে বিঘ্ন না হয় সেজন্য রাণী ষাট হাজার টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি রেখে যান।

তাঁর এই সম্পত্তির জন্য দেশবাসী তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে। প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন রাণী।

আজও কিন্তু সকলেই স্মরণ করে এই পুণ্যশীলা রমণীকে। মরেও তিনি অমর। তাঁর কীর্তিই বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁকে। ধন্য রাণী। ধন্য তোমার কীর্তি।

শ্রীশ্রীসারদামণি

জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। তবে তাঁর ক্ষমতা যতটুকু তার চেয়েও অনেক বেশী দানধ্যান করেন তিনি।

স্ত্রী শ্যামাদেবীও স্বামীর মতোই। দান করলে কখনো তার অভাব হয় না—সম্পদ কমে না। এই তাঁদের পবিত্র ধারণা।

এই পবিত্র সংসারেই জন্ম নিলেন মা সারদা।

সংসারের সার যে পরাবিদ্যা তাই যিনি দান করেন তিনিই সারদা।

যারা সার বুঝেছে, তাদের ঘর ছাড়া আর কোথায়ই বা আসবেন?

সেদিন ২২শে ডিসেম্বর—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ।

ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুর দেবতায় অগাধ ভক্তি। ঠাকুর নিয়ে খেলা করেন।

একবার ঠাকুর দেখতে গেছেন জগদ্ধাত্রী পূজার দিন।

হঠাৎ গভীর ধ্যানমগ্না হয়ে গেলেন, মন্দিরে বসে। পাড়ার মেয়েরা অবাক—তাদের সঙ্গিণীর একি ভাব? বুঝতে পারে না তারা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের অসংখ্য শিষ্যদের তিনি মা। কারণ তিনি ঠাকুরের সহধর্মিণী। শুধু ঠাকুরের শিষ্যদের নয়, তিনি আমাদেরও মা। সবার মা। জগজ্জননী তিনি।

ঠাকুর একরকম নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেন মাকে।

তখন ঠাকুরের বয়স চব্বিশ। মা তখন শিশু—মাত্র ৫ বছর বয়স তাঁর। জানতেন না বিয়ে কি? স্বামী কে?

বিয়ের পর সুদীর্ঘ ৮টি বছর মায়ের জয়রামবাটীতেই কাটল। একবার ঠাকুর অসুস্থ হলেন। তখন তিনি কামারপুকুরে। মা তখন এলেন তাঁকে সেবা করতে।

ঠাকুর কতই না উপদেশ দিতেন মাকে।

বাড়ীর গুরুজনদের সেবা, অতিথিদের সেবা, গৃহদেবতার সেবা কেমন করে করতে হয়—তাই। সংসারে নিঃস্বার্থ হতে হয়। নতুবা দুঃখের হাতে পড়বেই। ভোগ করতে হবে কঠিন বেদনা। সংসারে আছে কত পরাজয়। আছে শোক, রোগ, ব্যর্থতা।

নিজের ভোগের জন্যে যারা ব্যস্ত, দুঃখের দিনে তারা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

যারা নিঃস্বার্থ হয়ে সংসারে থাকে তারাই শান্তি পায়। পায় সত্যিকারের আনন্দ।

তাদের জীবনে বেদনা নেই। নেই ব্যর্থতা। কোন শালিনতা।

কামারপুকুরে সাত মাস কাটিয়ে মা এলেন জয়রামবাটীতে। ঠাকুর সেরে উঠেছেন।

জয়রামবাটীতে এলেন মা। আজ যেন তিনি নতুন আলোয় দেখতে শিখেছেন জগৎকে। মনে তাঁর নতুন উল্লাস। সংসারের সব যেন ভালো, সব যেন আলোয় ভরা।

আজ সংসারের সকলকেই তিনি খুসী করতে চান।

জয়রামবাটীতে কয়েকমাস কাটাবার পর মার ইচ্ছা হল দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। তখনকার দিনে কোন যানবাহন ছিল না—এখনকার মত। বাধ্য হয়েই তিনি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাবার সংকল্প নিলেন।

সঙ্গী একদল গঙ্গাস্নান যাত্রী। যাত্রীরা সারা পথ পায়ে হেঁটে চলেছে হাঁটতে হাঁটতে মা কিন্তু বড়ই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। পায়ে ফোস্কা দেখা দিল।

গায়ে জ্বর। তবু কাউকে কিছু না বলে হাঁটেন। বিকেলের দিকে পথে পড়লো তেলো-ভেলোর মাঠ। সেই ভীষণ তেপান্তরের মাঠের

বড়ই দুর্ণাম ছিল। ডাকাতের আড্ডা সেখানে। জনপ্রাণীর চিহ্ন-মাত্রও নেই।

যাত্রীরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান।

জ্বর গায়ে—মা বেশী জোরে হাঁটতে পারেন না। পিছিয়ে যান।

সন্ধ্যা নামে। ধূ ধূ জনহীন প্রান্তর। মা কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন। এমন সময় তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়ে একজন লোক।

দেখতে ঠিক যমদূতের মত। হাতে লাঠি—ডাকাত। নির্জন মাঠে মাকে একা পেয়ে তার ভারী আনন্দ। হাঁক দিয়ে ওঠে কে তুই? দাঁড়া। মা বলেন নির্ভয়ে—আমি যে তোমাদের মেয়ে গো। নাম আমার সারদা। দক্ষিণেশ্বরে তোমাদের জামাইএর কাছে যাব। পথ হারিয়েছি। পথ দেখিয়ে দাও বাবা!

সেই জনহীন মাঠে সঙ্গিহীনা সহায়হীনা মা সারদার দিকে তাকিয়ে নিমেষে যে কি পরিবর্তন এলো, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

আপনা থেকেই হাতের লাঠি নেমে আসে। কর্কশ কণ্ঠ হয় কোমল।

ডাকাত বলে—বেটী কোথায় যাবি চল। আমি নিজেই তোকে পৌঁছে দেব। এইভাবে মা এসে পৌঁছুলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর স্বামীর কাছে। ঠাকুরের সাহচর্যে মায়ের স্বাভাবিক অনুভূতি হয়ে উঠল অতি গভীর।

স্বামীর মধ্যে দেখতে পেলেন তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার ধনকে। তাঁর পথপ্রদর্শক গুরুকে।

তাই তাঁর আদর্শ মতই তিনি চলতে থাকেন। নিজেকে নিবেদন করেন নিঃশেষে। স্বামীর পথই তাঁর পথ। স্বামীর আদর্শই তাঁর আদর্শ।

এমনি অবস্থায় ঘটে গেলো এক অদ্ভুত ব্যাপার।

একদিন রাতে সারদামণি অন্ধকারের মধ্যেই গেছেন গঙ্গার ঘাটে নাইতে।

হঠাৎ যেন পা ঠেকল কিসের সঙ্গে। চমকে উঠলেন মা। একটা বিরাট কুমীরের মাথায় পা দিয়েছেন তিনি। কুমীর এক লাফে গঙ্গায় অদৃশ্য হয়। মা হতচকিত হয়ে পড়েন। ছুটে এসে ঠাকুরকে বলেন সব। হাসেন ঠাকুর।

মা বলেন অন্ধকারে গঙ্গায় নামতে বড্ড অসুবিধা হয় তাঁর।

ঠাকুরের এক কথা। মাকে ডাক। সব আঁধার দূর হবে।

ঠাকুরের কথা মা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন।

পরদিন ঘাটে যাবার সময় মার নাম স্মরণ করতে করতে চলেন।

নদীর সামনে দাঁড়াতেই দেখেন এক ঝলক তীব্র আলো পড়েছে ঘাটে। ঘাট আলোময়। আলো কোথা থেকে আসছে দেখতে ইচ্ছা হয় মার। মুখ ফিরিয়ে দেখতে চান। আবার সব আঁধার।

ঘাটের দিকে আবার ফিরতেই কিন্তু সব আলো। মা সব কথা বলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর বলেন—মা মাঝে মাঝে জানিয়ে দেন যে, তিনি অধম সন্তানের পাশেই আছেন।

নইলে ছেলে যে তাঁকে ভুলে যাবে। বড় ভয়ও পাবে হয়ত।

আরও একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল।

এর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে—মা কত বড় ছিলেন।

লক্ষীনারায়ণ একজন বড় ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী। ঠাকুরের ভক্ত।

ঠাকুরের সেবায় দশ হাজার টাকা দিতে চায় সে। নাছোড়বান্দা।

টাকার কথায় ঠাকুর শিউরে ওঠেন। বলেন টাকা তিনি নিতে পারবেন না। ও তাঁকে ছুঁতে নেই।

ভক্ত বলেন—আপনি নেবেন কেন? আমি নিজেই ও টাকা মায়ের নামে লিখে দেব। মাকে ডেকে পাঠালেন। সব খুলে বললেন।

সব শুনে মা বলেন—টাকা নেওয়া হবে না। কারণ তাঁর নেওয়া মানেই তো সেই ঠাকুরেরই নেওয়া। তাই টাকা তিনি কিছুতেই নেবেন না।

ফিরে গেলেন তিনি। অনেক দিন পরে এমনি আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল মায়ের জীবনে।

স্বামীজীর প্রচারের ফলে তখন ঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্য হয়েছেন বহু লোক। এমনি একজন ভক্ত ছিলেন রামনাদের রাজা।

সারদামণি যখন দক্ষিণ ভারত ঘুরতে যান তখন রাজা তাঁকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। পরম শ্রদ্ধা ভরে তিনি সব ঘুরে ঘুরে দেখান মাকে।

অবশেষে যুগ যুগ ধরে জমানো মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার দেখিয়ে রাজা অনুনয় করেন মাকে—তা থেকে মার যা ইচ্ছা বেছে নিতে। এতে তিনি কৃতার্থ হবেন। রাজার অনুরোধে কোনো ফল হয় না। মা কিছুই নিলেন না। বললেন—বাবা, এ তো আমায় ছুঁতে নেই।

স্বামীর কাছ থেকে যে-সব মনির সন্ধান তিনি জেনেছেন, তাতে সব মানিকই তাঁর-কাছে হয়েছিল মাটির তুল্য।

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। বহুদিন কেটে গেছে। মা গ্রামে গিয়ে সাধারণভাবে জীবনযাপন করেন।

নিত্যপূজায় জপধ্যানে সময় কাটে তাঁর।

ভক্তদের তা ইচ্ছা নয়। মাকে তারা নিয়ে এলো বেলুড় মঠে। গুরুর অভাবে ঘর ছাড়া বৈরাগী ছেলেদের জীবনের কেন্দ্র তো স্বয়ং মা-ই। মন্দিরে যে মার পূজা হয় এই মার মধ্যে তারা তাঁকেই দেখল।

মহাকবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র থেকে স্বুরু করে কতো পণ্ডিত শিক্ষিত ধার্মীক আসে মার কাছে। পায়ে মাথা দেয়। আশা করে শান্তি স্বস্তি।

কোনদিন কিন্তু তার জন্যে মার মনে এতটুকুও অভিমান জন্মায়নি। এতবড় সব শিষ্যদের জননী হয়েও তিনি ছিলেন একেবারে সাদাসিদে।

মার নিজের পেটের ছেলে কেউ ছিল না। সব ভক্তদেরই তিনি নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখতেন।

তখন মা বেলুড়ে নেই।

মা তখন গ্রামে। আমজেদ বলে এক ঘরামী এসেছে তাঁর বাড়ীতে কাজ করতে। দুপুরে তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে। খেতে দিচ্ছে নলিনী। মার ভাইঝি।

নলিনী খাবার এনে উঁচু করে আমজেদের পাতে ফেলে দেয়। ছোঁয়া গেলে যে জাত যাবে! মুসলমান! বাবাঃ!

দেখলেন মা। ছুটে এলেন। নলিনীকে ধমকে বললেন—

ওভাবে ভাত দিলে কি কেউ তৃপ্তি করে খেতে পারে?

তাকে সরতে বলে নিজেই পরিবেশন করতে থাকেন। মা যেভাবে ছেলের কাছে বসে খাওয়ায় ঠিক সেই ভাবেই আমজেদের পাশে বসে তাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। জল দেন খাওয়ার শেষে। তাঁর এঁটোও পরিষ্কার করলেন। নলিনী ছিল কাছে। চেঁচিয়ে ওঠে সে—ও কি কর পিসিমা! মুসলমানের এঁটো ছুঁয়ে তোমার যে জাত গেল। মার মুখে হাসি। বলেন—জাত যাওয়া কি অত সোজা রে? তা ছাড়া আমজেদ যে আমার ছেলে। ছেলের এঁটো মা পরিষ্কার করবে না তো কে করবে?

আশ্চর্য্য হয় নলিনী। মুখে তার বাক্যি সরে না। এমনি ছিল মার প্রাণ।

ভগিনী নিবেদিতা যখন মার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন মা তাকে ঠিক মেয়ের মতই দেখেছেন। একসঙ্গে বসে জলযোগ করেছেন বিধবা হয়েও। নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণী হয়েও।

অম্লানচিত্তে সেই বিদেশিনীকে গ্রহণ করেছেন নিজের জনের মত।

সাদরে। স্নেহমমতায় ভরে দিয়েছেন তাঁর মন। তিনি যে মা। মা সারদার মধ্যে নিবেদিতা যে বিশ্বমায়ের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন—তা তাঁর একটা চিঠিতে বড় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে—

মা আজ ভোরে সায়ার (একজন মেয়েভক্ত—আমেরিকায় বাড়ী) জন্যে প্রার্থনা করতে গির্জায় গেলাম। সবাই ভাবছিল মা মেরীর কথা। আমার কিন্তু মনে পড়ল তোমাকে।

সেই সুখ্যাতি। তেমনি স্নেহ ভরা চোখের চাউনি—হাতে যেন সোনার বালা।

তোমার চেহারা আমার মনের মাঝে ভেসে উঠল। আজ চেনা যেন যারা যে রোগশয্যায় শুয়ে আছে, তাতে তুমিই যেন একমাত্র সান্ত্বনা।

আর একটা কথা মনে হলো মা। মনে হলো আমরা ঠাকুরের আরতির সময়ে তোমার ঘরে বসে তাঁকে ব্যঙ্গ করে কতই না বোকামি করেছি। তোমার পায়ের কাছে বসে ছোট্ট খুকুর মত সব চাওয়াই ত সব পাওয়া।

মা, তুমি পরিপূর্ণ ভালবাসার। যে ভালবাসার মধ্যে উদ্দামতা বা আবেগ নেই—যে এক মধুর শান্তির ভাব, একটা দিব্য জ্যোতি।

আজ সবার মা সারদা আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আজও যেন তাঁর অমর আত্মার পবিত্র জ্যোতি আমাদের চতুর্দিকে পথ দেখাচ্ছে।

তিনি ভারতীয় নারীর এক অমর আদর্শ।

স্বদেশপ্রাণা প্রীতিলতা

ম্যাট্রিকের টেষ্ট পরীক্ষায় চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুলের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করল একটি মেয়ে। পেল পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

তার পর আই-এ পড়তে লাগল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশ করল। বি-এ। অবশেষে শিক্ষয়িত্রী হল একটি মেয়ে-স্কুলে।

পড়াশুনার বাইরেও কিন্তু এক পৃথক জগতের দরজা তার-সামনে খুলে গেছিল।

দেশমায়ের অশ্রুভরা চোখ যেসব তরুণ-তরুণীদের ঘরছাড়া করে এনেছিল সেও ছিল তাদের মধ্যেই একজন।

চট্টগ্রামে সেদিন গড়ে উঠেছিল একটি বিপ্লবী দল। দলের নেতা সূর্য সেন, সবাই বলে মাষ্টারদা।

কি করে যেন এঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হল প্রীতিলতার। দলে জড়িত হল সে। কি করে হল? কেউ তা জানে না। মেয়েটাকে কাজ দেওয়া হলো। একদলের লোকদের অন্যদলের খবর পাঠানো প্রয়োজন। কার্য্যপ্রণালী সব জানা প্রয়োজন।

মেয়েটি নিল সেই ভার। সংবাদ বিতরণ করত সে। হয়ত বনের মধ্যে বিপ্লবীরা এক হয়েছে। আলোচনারত তারা নূতন পরিকল্পনা ঠিক করছে। তাদের পাহারা দেবে কে?

স্থির হলো প্রীতিলতা এই কাজের ভার নেবে।

রিভলভার চালান, ছোরা খেলা, লাঠি খেলা সবই ভালভাবে

শিখেছিল মেয়েটি। দলের সেবার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, দেশমায়ের পরাধীনতা ঘোচাতে হবে।

বিদেশী শাসকরাও অবশ্য চুপচাপ বসে ছিলেন না।

তাঁদেরও ছিল কর্মতৎপর পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ।

নানা ভাবে তারা অকথ্য অত্যাচার চালালো চট্টগ্রামের সব লোকদের উপর। তাদের অত্যাচার থেকে নারী বা শিশুরাও পরিত্রাণ পায় নি। কিন্তু তবু তারা করেছে সুদিনের আশা।

যেদিনের অপেক্ষায় তারা রয়েছে। রয়েছে বিপ্লবীদল।

নিশ্চিত মৃত্যু আর বিপদকে তুচ্ছ করে চলেছিল বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন। স্বাধীনতা চাই। বিদেশীদের চলে যেতে হবে। ভারত ছাড়তে হবে।

ভারতবর্ষ ভারতবাসীর। অন্যের তাতে অধিকার নেই।

স্বাধীনতার জন্যে যে কোন ত্যাগ অতি তুচ্ছ তাদের পক্ষে।

অবশেষে একদিন তাদের চিন্তা কার্যে পরিণত হলো। বিদেশী শাসকদের পার্বত্যদুর্গ ভেদ করল বিপ্লবীরা এগিয়ে গেল বীরদর্পে। বিরাট চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার এলো তাদের দখলে।

পার্বত্য দুর্গটিকে দখল করে তাকে সুরক্ষিত করবার জন্য বিপ্লবীরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের সেই শুভদিনটি হলো—১৮ই মে, ১৯২১।

বিদেশী শাসকরা কিন্তু বিপ্লবীদের এই স্পর্ধা ক্ষমা করলো না। সদম্ভে এগিয়ে এল বিদেশী ফৌজ। বিপ্লবীদের সঙ্গে বিদেশীদের সংগ্রাম আরম্ভ হলো—জালালাবাদ পাহাড়ে। অনেকে এই যুদ্ধে প্রাণ দিল। অনেকে ধরা পড়ল।

মাষ্টারদা কিন্তু নিখোঁজ। তাঁর কোন সংবাদই পুলিস পেল না। বের করতেও পারল না। তার সঙ্গে নির্মল, অপূর্ব প্রভৃতি যুবকরাও—

পলাতক হলো। আর তাদের সঙ্গে পালালো এই মেয়েটি। যাকে পুলিশের লোকেরা বিলক্ষণ ভয় করতো।

পুলিশের ভাষায় সে ছিল—বাংলার "যোয়ান অব আর্ক"।

সেদিন হয়ত তাদের এই কথায় বিদ্রূপ মেশানো ছিল। আজ কিন্তু সারা ভারত তাঁকে সম্মান করে আদর্শ বীরাঙ্গনা বলে। সেদিনের প্রীতিলতা ছিলেন—একজন বিপ্লবী। আজ তিনি দেশপ্রেমিকা।

জালানাবাদ পাহাড় থেকে চলে গিয়ে বিপ্লবীরা লুকিয়েছিল এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে। নাম তাঁর সাবিত্রীদেবী। রাতে হঠাৎ পুলিসের হানা। মুখোমুখি সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল।

সেই যুদ্ধে প্রাণ দিল নির্মল আর অপূর্ব। প্রাণ দিল আরও কয়েকজন পুলিসের লোক। নিহত হলেন ক্যাপটেন ক্যামেরণ সাহেব। প্রচণ্ড সংগ্রাম চলল দুদলের মধ্যে। এবারও কিন্তু পালালেন মাষ্টারদা। সঙ্গে প্রীতিলতা।

দেশের জন্য স্বেচ্ছায় হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে সেদিন বাঙালী প্রমাণ করেছে তারা ভীরু নয়। তাদের কাছে প্রাণও তুচ্ছ।

শুধু কি ছেলেরা? মেয়েরাও প্রমাণ করল তাদের দুঃসাহস। মেয়েদের স্বাধীনতা স্পৃহাও বোধ হয় দেশের ছেলেদের চাইতে কম নয়।

বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো।

দুঃসাহসিক পণ নিয়ে এগিয়ে গেলেন বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা। বাংলার মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে হবে একটি আদর্শ মেয়ের চরিত্র।

সে আদর্শ সত্যই দেশপ্রেমিকার। দেশের জন্য উৎসর্গ করতে হবে প্রাণ। দেশমাতা চান নতুন রক্ত। নতুন বলি।....

চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠেই পাহাড়তলী। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। সাজান ছবির মত সুন্দর। এই শহরের একপ্রান্তে ইউরোপীয়ানদের ক্লাব। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে চলে নাচ, গান, পান, ইত্যাদি। মাষ্টারদা নতুন খবর পেলেন।

চট্টগ্রামের বুকে অত্যাচারের বন্যা বইয়েছিল যারা, তাদেরই আড্ডা সেখানে—ক্লাবে। আমোদের ফাঁকে ফাঁকে চলে নতুন অত্যাচারের পরিকল্পনা। তার কেন্দ্র হলো ঐ ক্লাবঘর।

একদিন গভীর রাত। নাচগান চলেছিল; হঠাৎ যেন ওপরে বজ্রপাত হলো। বেজে উঠল মহাকালের প্রলয় ডমরু।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ চলল—উত্তপ্ত রিভলভার। বোমা ফাটতে লাগল অবিরাম। অত্যাচারী ইউরোপীয়ানদের অন্তিম কান্না শোনা গেল। আকাশ-বাতাস মথিত হল সে কান্নায়।

এই বিরাট আক্রমণের নেতৃত্ব কার হাতে?

বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা। প্রীতিলতা ওয়াদ্দার। নিজের হাতে রিভলবার থেকে সমানে গুলি ছুঁড়লো সে।

ধ্বংসলীলা শেষ হল। বিপ্লবীরা ফিরে গেল। ফিরল না কিন্তু স্বয়ং প্রীতিলতা।

সে আর ফিরবে না। কর্তব্য শেষ হয়েছে তাঁর। এবার যাত্রা করলেন তিনি অমরধামের পথে।

বোমায় তিনি আহত হয়েছিলেন।

বুঝলেন দল হয়ত এবার বিব্রত হবে তাঁকে নিয়ে। তাই তীব্র বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন তিনি সেই সময়েই। নিজেকে উৎসর্গ করলেন দেশমাতৃকার পায়ে সুন্দর সুগন্ধি একটি ফুলের মতো। শুধু বেঁচে রইল তাঁর নাম।

আজ তিনি বাঙ্গালীর আদর্শ একটি বীর নারী।

মহিয়সী সরোজিনী

মাত্র বারো বছর মেয়েটির বয়স।

কিন্তু কম বয়স হলেও সে লেখাপড়ায় পিছিয়ে ছিল না।

এত অল্প বয়স। তবু উঁচু ক্লাসে পড়ে। শিক্ষক শিক্ষিকারা তাই বড়ই স্নেহ করেন মেয়েটিকে। আপন মনেই মেয়েটি খাতা আর কলম নিয়ে বসেছিল। বীজগণিতের একটা কঠিন অঙ্কের সমাধান করতে হবে। চেষ্টা করছিল সে সেইজন্যে। অঙ্কের সমাধান হলো না।

কিন্তু সেদিনই হঠাৎ নতুন এক জগতের দ্বার যেন খুলে গেল তার সামনে। মেয়েটি খাতায় লিখে ফেলল এক সুদীর্ঘ কবিতা।

পাহাড়ী ঝরণার মত তা বয়ে চলল। সরল, সহজ কাব্য প্রতিভা। সেদিন থেকেই নতুন এক বিপ্লব শুরু হয় তার মনে। একের পর এক কবিতা লিখতে লাগল সে। অল্পদিনেই সুকবি হল সে। খুব খ্যাতিও লাভ করল। তারপর তার জীবনে একের পর এক অনেক সুন্দর কবিতা সে রচনা করল।

পরবর্তীকালে তার কবিত্বের পরিচয় পেয়ে স্বদেশে ও বিদেশে সব জায়গায় তার মুগ্ধ ভক্তরা অজস্র প্রশংসা করল তাঁর। তারা তাঁকে বলল—"ভারতের বুলবুল"। এই অসাধারণ কবিত্ব কার?

তিনিই হলেন কবি সরোজিনী নাইডু।

যিনি ভবিষ্যতে কবিতা ছাড়াও জীবনের নানাক্ষেত্রে নিজের একটি পৃথক স্থায়ী আসন দখল করেছিলেন। যাঁর স্বদেশপ্রেম, যাঁর বক্তৃতা, যাঁর মহত্ব আজও ভারতবাসী স্মরণ করে প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে। শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে।

সরোজিনীর বাবা ছিলেন ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। বাঙালী হলেও তাঁকে সারা জীবন কাটাতে হয়েছে সুদূর হায়দ্রাবাদে। তিনি সেখানেই চাকরী করতেন। তাই বাংলাদেশের সংস্পর্শে তিনি প্রথম জীবনে আসতে পারেননি।

মাত্র বারো বৎসর বয়সে সরোজিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন। ষোল বছরে বিলেতে যান। উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা—বিলেতে ছিলেন তিন বছর।

সেখানে থাকার সময় তিনি অনেক উচ্চশিক্ষিত ইংরাজদের সঙ্গে পরিচিত হন। তারা প্রত্যেকেই তাঁর কবিত্বশক্তির প্রশংসা করেছেন একবাক্যে। তাঁর কবিতা বড়ই মিষ্টি। যেন পাখীর গান।

বিখ্যাত পণ্ডিতদের মতে স্বাধীন প্রকৃতির সঠিক পরিচয় জানতে হলে সরোজিনীর কবিতা অবশ্যই পড়া দরকার। বিখ্যাত মাদ্রাজী ডাক্তার হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধান চিকিৎসক এম. জি. নাইডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

বিয়ের পর নতুন এক কাজে নামলেন তিনি। যার জন্যেই আজও সারা ভারতের লোকের কাছে তিনি হলেন এত প্রিয়। মহাত্মা গান্ধী তখন দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে কংগ্রেসের কাজ শুরু করেছেন।

তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশের লক্ষ কোটি লোক। এদের মধ্যে যাঁরা পুরোধা তাঁদের প্রধানই হলেন সরোজিনী।

সারা ভারতের নানা জায়গায় তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। হিন্দু-মুসলমান—ঐক্যের বিষয়ে। জাগিয়ে দিলেন স্বদেশপ্রীতি। জানিয়ে দিলেন তারা ভাই—ভাই।

এরপরই ইংরাজরা রচনা করল ভারত-ইতিহাসের এক অতি জঘন্য অধ্যায়। জালিয়ানাবাগে নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর অত্যাচারী ইংরেজ গুলি চালালো—বয়ে গেল রক্তের বন্যা।

বর্বরোচিত অত্যাচার করে জানিয়ে দিল যে প্রত্যেকে ভারতীয় রয়েছে তাদের বুটের তলায়। আর থাকবেও সেখানে। না থাকলেই এরকম হবে। ইংরাজের খাস বাসভূমি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সরোজিনী নাইডু তাদের এই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। সারা ইংল্যাণ্ড কেঁপে উঠল। ইংরাজ জাতি হল চঞ্চল।

এরপর দেশের বুকে ফিরে সরোজিনী প্রাণমন ঢেলে দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করলেন। অক্লান্তভাবে সেবা করলেন ভারতীয় কংগ্রেসের। নিজে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করলেন। তা চালালেনও। অবশেষে পরাধীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পেলেন তিনি—জাতীয় কংগ্রেসের তিনি হলেন সভাপতি।

তারপর ১৯৪২ এর আন্দোলন সুরু হলো।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরোজিনী সেদিন কারাবরণ করলেন।

উচ্চশিক্ষিত কবি সরোজিনী। তিনি পেলেন দিকে দিকে দেশপ্রেমের পুরস্কার। তাঁর কারাবরণে বাঙালী নারীর সম্মান সেদিন ছড়িয়ে পড়ল। দেশ থেকে দেশান্তরে সারা বিশ্বে।

কিন্তু কয়েকটা বছরের মধ্যেই চাকা ঘুরে গেল। এ দেশকে স্বাধীনতা দিল ইংরাজ। এ দেশ ছেড়ে চলে গেল তারা নিজেদের দেশে। গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" বাণী সফল হলো—সার্থক হলো।

সেই শুভ লগ্নে উত্তর প্রদেশের গভর্ণরের পদ গ্রহণ করলেন সরোজিনী নাইডু।

অবশেষে একদিন কর্মক্লান্ত সরোজিনী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন। যাত্রা করলেন মরণ সাগরের ওপারের এক অসংলোকের পথে।

লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট হাউসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এই মহিয়সী নারী। ভারতের বুলবুলের গান চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেল। শুধু পড়ে রইল তাঁর স্মৃতি। তাঁর কবিত্ব, বীরত্ব, মহত্ব, তাঁর অমর স্মৃতি।

মাতঙ্গিনী হাজরা

উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল। ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে কালো অধ্যায় এই একটি বছর। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণীয় বৎসর।

তখন আবার চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ আর এশিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়ে। এই সময়েই মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন—ইংরেজ ভারত ছাড়। বিদেশী শাসকের গদি টলমলিয়ে উঠল। তারা তাঁকে কারারুদ্ধ করল। তার বিদ্রোহীকণ্ঠকে রোধ করার জন্যে।

সেই সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন তাঁর সঙ্গীরা। সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী হলেন।

বিদেশী শাসক ভাবল প্রবল অত্যাচার চালালেই ঘুচে যাবে ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহা। ভারতবাসী কিন্তু মরিয়া। একমন—একপ্রাণ। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদেশী শাসকের হাত থেকে শাসনযন্ত্র কেড়ে নেবার জন্যে। স্বাধীন তারা হবেই। তার জন্যে মরণপণ।

এই বিয়াল্লিশের আন্দোলনে দেশপ্রেমিকদের বুকের রক্তে যে সব জায়গা পবিত্র হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে একটি ছিল চিরবিখ্যাত মেদিনীপুর।

বৃটিশ শাসনকে তুচ্ছ করল সে।

সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেন্ট।

কি অসামান্য সাহস তাদের! কি অপূর্ব স্বাধীনতাপ্রীতি!

জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনীপুরের লোকেরা বিদেশীদের অন্যায় কাজে বাধা দিতে লাগল। বিদেশীদের সঙ্গে এই নতুনভাবে গঠিত স্বাধীনতাকামী জাতীয় সরকারের সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠল।

পুলিসের গুলি ছুটল। মারা গেলেন তিনজন মেদিনীপুরবাসী। সেদিন—৮ই সেপ্টেম্বর। সারা মেদিনীপুরে হরতাল প্রতিপালিত হল—পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীও চুপ করে নেই। শুরু হল নির্মম অত্যাচার। নারী পুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচার চলল প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করে দিনে রাতে। পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্মীরা প্রত্যেকটি নারীকে আত্মরক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র সরবরাহ করতে লাগলেন। তারপর বসল জাতীয় সরকারের প্রকাশ্য বিশাল অধিবেশন। প্রস্তাব গৃহীত হলো—সমস্ত বিদেশী সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলিকে দখল করে নিতে হবে। পরদিন থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল নির্দেশমত।

একরাতের মধ্যে ত্রিশটি পোল উড়িয়ে, কুড়ি জায়গায় গভীর গর্ত কেটে আর দুশো টেলিগ্রাফ পোষ্ট ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত সংযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে ফেলল মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবীরা।

বিপ্লবীদের প্রধান বাহিনী পরদিন মেদিনীপুর শহরের থানা দখল করবার জন্য এগিয়ে চলল। শুরু হল মুখোমুখি সংগ্রাম—সশস্ত্র সৈন্যদের সাথে প্রকাশ্য লড়াই। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এলো বন্দুকের গুলি। জনতাকে লক্ষ্য করে পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালাতে শুরু করল। একদল সন্তানের পরিবর্তে অন্যদল এসে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে লাগল। সকলের মুখে এক কথা—বিদেশী, ভারত ছাড়। ইংরেজ ভারত ছাড়।

তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী।

এই বয়সে সাধারণতঃ আমাদের দেশের মেয়েরা অথর্ব হয়ে পড়ে। শুয়ে থাকেন সব সময় কাঁথা মুড়ি দিয়ে। মাতঙ্গিনীর কিন্তু সে অবসর ছিলো না। মাতঙ্গিনী যে বীরাঙ্গনা। দেশ সেবায় নিয়োজিতা। শত শত সন্তানের রক্তাপ্লুত দেহ দেখে বুঝি তাঁর মাতৃহৃদয় ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

একটি বিরাট জাতীয় বাহিনীর সামনের অংশে জাতীয় পতাকা হাতে মেদিনীপুরের উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হতে লাগলেন তিনি জনতার সঙ্গে সঙ্গে। কিছুদূর এগোতেই শুরু হল বিদেশীদের প্রচণ্ড বাধাদান। নির্মম অত্যাচার। প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। কিছুই ভ্রূ-ক্ষেপ করলেন না মাতঙ্গিনী হাজরা। পতাকা হাতে তিনি চললেন এগিয়ে।

তাঁর কানের দুপাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কিন্তু এতে ভ্রূক্ষেপও নেই।

বিদেশী শাসকদের ভাড়া করা এদেশী সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন উচ্চস্বরে—লজ্জা করে না তোদের? কাপুরুষের দল। নিজের দেশকে এভাবে অন্যের হাতে বিকিয়ে দিতে চাস!

লজ্জা তাদের ছিল না। ছিল না কোন হৃদয়বোধ। মায়ামমতা, দরদ। থাকলে কি তারা একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধার উপর গুলি চালাতে পারত?

দুটো গুলি এসে একেবারে তাঁর হাতে বিদ্ধ হলো। পতাকা কিন্তু তিনি তবুও ছাড়লেন না। হাত বদল করে নিলেন।

অন্য হাতে পতাকা নিয়ে এগোতে লাগলেন বীরবিক্রমে। কোন দিকে না তাকিয়ে—এমন কি নিজের দিকেও না।

তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য বিপ্লবীরাও এগিয়ে চলল তাঁর পিছনে পিছনে।

ধীরে ধীরে রক্তক্ষয়ে বৃদ্ধার দেহ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। তবুও পতাকা ছাড়েন না তিনি। ধরে থাকেন দৃঢ়মুষ্টিতে। পতাকাই তো তাঁর পরিচয়। পতাকাই তাঁর প্রাণ। তাকে তিনি ছাড়বেন কি করে?

তাঁর এই বীরত্ব সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ভাড়া করা এদেশী সৈন্যদের আর সহ্য হলো না। বন্দুকের উত্তপ্ত গুলি ভেদ করলো মাতঙ্গিনীর বুক।

বন্দেমাতরম্।

শেষবারের মত উচ্চারণ করেন বৃদ্ধা দেশপ্রাণা মাতঙ্গিনী হাজরা।

তারপর ? তারপর ধীরে ধীরে এই বীর নারী লুটিয়ে পড়েন মাটির বুকে অন্তিমশয্যায়।

আজ আর মাতঙ্গিনী আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আছে তাঁর নাম।

মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও তিনি তাঁর নামকে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে তাঁর নাম। তিনি চিরস্মরণীয়া বীর নারীদের অন্যতমা।

ধন্য বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী ! ধন্য তাঁর দেশভক্তি !

সুসাহিত্যিকা স্বর্ণকুমারী

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি। সদা চঞ্চল যে। বাড়ীর সকলে তাই তাকে খুব ভালবাসে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের খ্যাতি তখন সারা বাংলাদেশে। মেয়েটির জন্ম এই পরিবারে। সেজন্য তার মনে কিন্তু কোন অহঙ্কার বা গর্ব নেই। বাবা দেবেন্দ্রনাথ—মহর্ষি আখ্যা পেয়েছেন। ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ—লোকে তাঁকে বলে প্রিন্স। দুজনেই মেয়েটিকে খুব স্নেহ করেন।

তার অদ্ভুত ধীশক্তি। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তখন আমাদের দেশে কিন্তু নারী শিক্ষা এত প্রবর্তিত হয় নি।

মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া শুধু অর্থের অপব্যয় মাত্র—এই ধারণাই ছিল সাধারণ মানুষের মনে। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু একথা মোটেই মানতেন না। তাঁর মন ছিল সংস্কার মুক্ত—উদার। এ কথাকে তাই তিনি আমল দিতেন না একেবারেই।

ঠাকুরবাড়ী তখন কবি সাহিত্যিক আর শিল্পীদের লীলাভূমি। কত সুশিক্ষিত লোকও আসে এখানে। হয় সাহিত্য-সমালোচনা—সংগীতচর্চা। নানা কাব্যপাঠ।

ছোট বেলা থেকেই মেয়েটির স্মরণশক্তি ছিল অদ্ভুত।

ঠাকুর বাড়ীতে যে সব বিখ্যাত ও প্রতিভাসম্পন্ন মেয়েরা বেড়াতে আসেন—তাঁরা প্রায় সকলেই চেনেন এই মেয়েটিকে। দেখলেই তাঁরা কাছে টেনে যেন আদর করেন—একটি কবিতা শোনাতে বলেন।

মেয়েটি সুমিষ্টকণ্ঠে গড়গড় করে কবিতা আবৃত্তি করে চলে। একটির পর একটি। ঈশ্বর গুপ্ত আর মধুসূদনের সব কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ। ইংরাজী কবিতাও বাদ নেই। এমন কি সংস্কৃতও না।

দেবদেবীর বহু স্তোত্রও সে আবৃত্তি করে, সুললিত কণ্ঠে। সকলেই তাই স্নেহ করেন তাকে। বলেন—মা তোমায় বড় হতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে এই বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যেও আছে প্রতিভা। আছে কবিত্বশক্তি

হাসে মেয়েটি। কেউ কিন্তু জানে না যে তাঁর মনের গোপনে কি এক নতুন বীজ উপ্ত হয়েছে। আগামী দিনে সেই বীজ অঙ্কুরিত হবে।

বিস্তার করবে পত্রপল্লব—আলিঙ্গন করতে ছুটবে আকাশকে।

সেদিন সকলে জানবে তার এই কর্মোদ্যমের কথা।

ঠাকুর বাড়ীতে বিরাট লাইব্রেরী। রাশিরাশি বই। বড় বড় সব আলমারী বোঝাই। তার মাঝ থেকে মেয়েটি বই খুঁজে নেয় নিজের নিজের মনের মত। চুপি চুপি পড়াশুনা করে। নিজের মনে একাকী।

তার আছে কয়েকটি খাতা। সে তাতে লেখে নিজে নানা কল্পনার কথা। তার মনকে তুলে ধরে ঠিক ছবির মত করে।

যে সময় এদেশের মেয়েরা ভয় পেত পড়াশুনা করতে সেই যুগে মেয়েটি লিখে চলে কবিতা, গল্প উপন্যাস।

সত্যিই সে আসনে আছেন দিন একটি অকল্পনীয় ঘটনা।

বাংলার মেয়েরা উপন্যাস লিখবে এ যেন চিন্তার বাইরে। কে হবে সেই উপন্যাসের পাঠক ?

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল মেয়েটি।

তার দুটি একটি লেখা ছাপা হতে লাগল এখানে, সেখানে। মহিলা সাহিত্যিকের যশ গৌরব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, সেদিকে, চারিদিকে সর্বত্র তাঁর খ্যাতি। পরবর্তী কালে এই মেয়েটিই একদিন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল সারা ভারতে।

তাঁর রচিত প্রতিটি উপন্যাস লাভ করেছিল প্রচুর সমাদর। অবশেষে তিনি হলেন—"ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকা। বহুদিন তিনি যুক্ত ছিলেন এই কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

বাংলা সাহিত্যকে সেবা করেছেন তিনি বহুদিন। নিজের নামকে করেছেন চিরস্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত নারীরা আজ সম্মানের সঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট আসনের অধিকারিনী—তাঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী অন্যতমা। উপন্যাস সাহিত্যে তিনি প্রথমা। বাংলার মহিলা সমাজ যেন তাঁকে ভুলে না যান।

তিনিই মহিলাদের সাহিত্য রচনার প্রথম পথনির্দেশ করেন।

আমরা আজও তাঁকে শ্রদ্ধা করি।—স্মরণ করি।

অহল্যাবাঈ

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মালব দেশে সাধারণ একজন কৃষিজীবি আনন্দ-রাও সিন্ধের ঔরসে অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। এই বালিকা ছিল অসামান্যা রূপবতী ও গুণবতী।

খুব অল্প বয়সেই পিতার শিক্ষার গুণে শাস্ত্র এবং অস্ত্রবিদ্যায় ইনি বেশ পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিলেন। ইন্দোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও হোলবায়ের পুত্র কুন্দ রাওয়ের সাথে এঁর বিয়ে হয়।

মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে এক পুত্র এবং এক কন্যা নিয়ে তিনি হঠাৎ বিধবা হলেন।

স্বামী দেহত্যাগ করার পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ভার তিনি নিজের হাতেই তুলে নিলেন। প্রথমটায় স্ত্রীলোকের শাসন কিছুতেই মানতে চাইল না দেশের জনগণ। অপ্রকাশ্যে অসন্তোষ ও প্রকাশ্যে কয়েকজন বিদ্রোহ ঘোষণাও করেছিল। কিন্তু গুণবতী ও ধৈর্যশীলা এই নারী বেশ ধৈর্যের সাথে সব বিশৃঙ্খলা—সব বিদ্রোহ দমন করে দক্ষতার সাথে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতে লাগলেন।

রাণী অহল্যাবাঈ হিন্দুধর্মের মূর্তিময়ী প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন।

তাঁর হৃদয় দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অসংখ্য উচ্চগুণ দ্বারা মণ্ডিত ছিল।

সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থানে লুপ্ত এবং ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। পুণ্যধাম বারাণসীতে এই মহিয়সী মহিলার অনেক কীর্তি আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আজ তিনি সারা ভারতের গৌরব—নারীদের মহৎ আদর্শের প্রতীক।

উমাসুন্দরী

শতাধিক বছর আগে নবদ্বীপে বুনো রামনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মণীর নাম উমাসুন্দরী। পণ্ডিত গৃহিণীর সারল্য ও অনাড়ম্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক রমণীর আদর্শ ছিল।

বুনো রামনাথের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। অনেক কষ্টে তাঁদের দিনাতিপাত হ'ত। শাক ভাত ছাড়া তাদের প্রায়ই আর কিছু জুটতো না।

শাঁখার পরিবর্তে তিনি হাতে এক গাছা লাল সুতো বাঁধতেন। কারণ শাঁখা কিনে পরবার মত তাঁর কাছে পয়সা ছিল না। কিন্তু এতেও তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না।

শোনা যায়, কৃষ্ণনগরের মহারাণী একদিন ঘাটে স্নান করতে এসে ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন এক মহিলা শাঁখার বদলে লাল সুতো হাতে বেঁধেছে এবং সেই সুতো তিনি ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার হাতে বাঁধছেন।

তা দেখে রাণী যেন একটু মুচকি হাসলেন। এই বিদ্রুপাত্মক হাসির অর্থ বুঝতে খুব বেশী বেগ পেতে হ'ল না এই উমাসুন্দরীকে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাণী তার দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করছেন। তাই তখনই স্বামী গরবে গরবিনী সতী উমাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "আমার এই লাল সুতোয় তোমাদের গোটা নবদ্বীপ বাঁধা আছে। এই লাল সুতো যেদিন ছিঁড়বে, সেদিন সারা নবদ্বীপ অন্ধকার হবে।

মহারাণী পরে যখন জানতে পারলেন যে, বুনো রামনাথের স্ত্রী ইনি, তখন তিনি নিজেও মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। সতীত্ব প্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতি দারিদ্র্য দুঃখকে পরাভূত করেছিল। এমনি আদর্শ জীবন সত্যিই বিরল।

কর্মদেবী

চিতোরের বিখ্যাত রাণা সমর সিংহের প্রধানা মহিষীর নাম ছিল কর্মদেবী। তিরৌরী যুদ্ধে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্বামী সম্মুখ যুদ্ধে দেহত্যাগ করলে, তিনি চিতোর ও মেবার রক্ষার জন্য পাঠান সেনাপতি কুতুবুদ্দিনের সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করেন এবং অসীম ধৈর্য্য ও বীর্য্য সহকারে স্বামীর রাজ্য রক্ষা করেন। নিজে সেনাবাহিনী চালনা করে তিনি বিপক্ষের সৈন্যদের স্তব্ধ করে দেন।

সতীত্বে, শৌর্য্যে, দানে কর্মদেবীর নাম আজও তাই ভারতের নারীদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয়া।

আজও কর্মদেবীর বীরত্ব এবং মহত্বের খ্যাতি সারা রাস্থানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

চন্দ্রমণি দেবী

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সৌভাগ্যবতী জননীর নাম হলো চন্দ্রমণি দেবী। কামারপুকুর গ্রামের ইনি ছিলেন লক্ষ্মীস্বরূপা।

আদর্শ ব্রাহ্মণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অর্চনায় ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় চন্দ্রমণি ছিলেন অক্লান্তকর্মিনী আদর্শ নারী। অকাতর শ্রমশালিনী এই নারী সংসারাশ্রমের পরমধর্ম পালনে কখনও অনুমাত্র ত্রুটি বা তাচ্ছিল্য করতেন না।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এঁর গর্ভে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। পতিব্রতার সরলতার মূর্তিমতী প্রতিমা, পতিপ্রাণা চন্দ্রমণি দেবীর সন্তান-বাৎসল্য ছিল অনন্যসাধারণ। এমনি মা না হলে কি তাঁর গর্ভে স্বয়ং নররূপী নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হতে পারে?

পদ্মাবতী

বাংলা সাহিত্যের কলকণ্ঠ অবিস্মরণীয় বৈষ্ণব কবি জয়দেবের সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন পদ্মাবতী। দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জয়দেব কৃষ্ণনাম কীর্তন ও ভজনে অতিবাহিত করতেন। তারপর চলত বিখ্যাত গ্রন্থ গীতগোবিন্দ রচনা। পদ্মাবতীও ততক্ষণ পর্যন্ত জলবিন্দু স্পর্শ না করে স্বামীর ধর্মকার্যে সহায়তা করতেন।

পদ্মাবতীর ধর্ম ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হ'য়ে জয়দেবের আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পদ্মাবতীকেই দর্শন দেন।

সতীর মাহাত্ম্যেই জয়দেব পরে অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহ ও দর্শন লাভ করেন।

আজও পতিব্রতা নারীর মহত্তম আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা হয়ে আছেন। নিজে অপূর্ব সঙ্গীত-সাধিকা হয়েও তিনি চিরদিন পাতিব্রত্যের আসনকেই বড় বলে মনে করেছেন। তাই তিনি চির অবিনশ্বর ; চির জ্যোতির্ময় এক অম্লান আসন পেয়েছেন বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মনে।

পদ্মিনী

পদ্মিনী চিতোরের বীর রাণা ভীমসিংহের পত্নী। অলোকসামান্যা সুন্দরী ও বীরাঙ্গনা ছিলেন রাণী পদ্মিনী। এঁর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে পাঠান সুলতান আলাউদ্দীন তাঁকে পাবার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে চিতোর আক্রমণ করেন।

রাণা ভীমসিংহ পাঠানের হাতে বন্দী হলে পদ্মিনী বহু রাজপুত বীরের সাহায্যে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করে রাণাকে উদ্ধার করেন।

চরিত্রহীন দুর্দান্ত পাঠানের লোলুপ দৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় আক্রান্ত হ'য়ে অসহায় হ'য়ে পড়ল। সেই সময় অন্য কোন উপায় না দেখে পদ্মিনী তাঁর সহচরীদের নিয়ে 'জহর ব্রতের' অনুষ্ঠান করলেন। এই জহর ব্রত হ'চ্ছে জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত প্রবেশ করে সতীদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবন ত্যাগ করা রাজপুত নারীদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ছিল।

তাই পদ্মিনীর এই জহর ব্রত গ্রহণের ইতিহাস চিরদিন ইতিহাসে লেখা থাকবে। রাজপুত জাতির ইতিহাসে এই মহিয়সী নারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লেখা আছে। আজও আদর্শমতী নারী বলতে রাণী পদ্মিনীর উপমা দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

নাম ও প্রেমের দেবতা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্নী হলো পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

চৈতন্যদেব চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করেন। চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করলে পরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যে তীব্র বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করে পতির নির্দেশকে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিজের জীবনে সার্থক করে তুলেছিলেন তা অতুলনীয় বলেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ তার বর্ণনা করেছেন।

পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাই ভারতের সাধ্বীগণের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া অন্যতমা বলে কীর্তিতা হ'য়েছেন।

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, দান, ধ্যান, ধর্মোপদেশ পালন ও উপদেশ দান করে সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন সারাটা জীবন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি-প্রেম—শাশুড়ীর প্রতি একনিষ্ঠ সেবার ইতিহাস নারীদের অনুকরণীয়। পতির আদর্শকে একান্তভাবে তিনি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন।

নারীরা বিষ্ণুপ্রিয়ার আদর্শকে মনের মাঝে রেখে এরূপ পতিপ্রেম ও শাশুড়ীর সেবা করলে বিষ্ণুপ্রিয়ার নামের মহিমা সার্থক হবে।

ভগবতী দেবী

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামের সিংহশিশু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের নাম ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবী সত্যিই ছিলেন আদর্শ রমণীদের মধ্যে অন্যতমা।

স্বামী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না সত্যি কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন গুণবান তেমনি তাঁর ছিল এই পতিপরায়ণা নারী গুণবতী।

কেমন করে নিজের পুত্রকে স্বধর্মনিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে হয়, তা এই শ্রেষ্ঠ হিন্দু নারীর ভালো করেই জানা ছিল। তাই শৈশবে এবং যৌবনকালে বিদ্যাসাগর মায়ের কাছ থেকে যত ভাবে যত শিক্ষা লাভ করেন, পরবর্তী জীবনে তাই-ই তাকে সব কর্মে ও সব প্রচেষ্টার সার্থকতা এনেছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনের পশ্চাতে যে সাধনা ছিল, তার অনেকখানি প্রেরণাই তিনি পান নিজে মায়ের কাছ থেকে। এই জন্যই তাঁর চরিত্রে মাতৃভাব এক অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছিল।

তাঁর মায়ের ছিল দয়ার প্রাণ। নিজে ছেঁড়া কাপড় পরে থেকেও গরীব দুঃখীকে ভালো কাপড় দান করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

দুঃখীর জন্য তার মন সব সময় কাঁদতো। একবার বিদ্যাসাগর

মহাশয় তাঁকে শীতের সময় লেপ কিনে দেন। কিন্তু তিনি তা গায়ে না দিয়ে কাঁথা গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করছেন দেখে বিদ্যাসাগর তার কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেছিলেন—তাঁর গ্রামের অনেক লোকের এই সামান্য কাঁথাও জোটে না। শীত নিবারণের জন্য সেখানে তিনি কি করে লেপ গায়ে দিয়ে অনায়াসে কাল কাটাবেন ?

বিদ্যাসাগর তখন বুঝতে পারলেন যে গ্রামের দুঃখীদের দুঃখ দূর না করে মা লেপ গায়ে দেবেন না। তাই গ্রামের সকলের জন্য তিনি কম্বলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই দেখা যায় এই অসাধারণ নারীকে মা-রূপে পেয়েছিলেন বলে বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর আখ্যাও পেয়েছিলেন। ভগবতী দেবী নারীদের নমস্য।

মহারাণী স্বর্ণময়ী

শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীর বুকে শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে যে মহিয়সী মহিলা জন্মগ্রহণ করে চরিত্রের ঔদার্য্য ও দানশীলতার অক্ষয় যশোরাশি অর্জন করেন, তিনিই চিরস্মরণীয়া স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণময়ী প্রকৃতই যেন সোনার প্রতিমা—এমনই অনিন্দ্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য্য। দরিদ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করলেও স্বর্ণময়ী সর্বসুলক্ষণা ছিলেন বলে কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী কান্তবাবু তাঁর পৌত্র কৃষ্ণনামের সাথে এঁর বিয়ে দিয়ে রাজলক্ষ্মীরূপে এঁকে বরণ করে আনেন।

স্বামীর তত্ত্বাবধানে ইনি জমিদারী বিচার শিক্ষা লাভ করেন এবং স্বামীর পরলোকগমনের পরে বিশাল জমিদারী বিশেষ দক্ষতায় সাথে

পরিচালনা করেন এবং জনহিতকর বহু-কার্য্যে অজস্র অর্থ অকাতরে দান করে সরকারের কাছ থেকে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'মহারাণী' উপাধি লাভ করেন।

সেই থেকে তাঁর বংশধররা 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন।

হিন্দু বিধবার আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সযত্নে পালন করে অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করে ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এই পূণ্যশ্লোকা নারী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরী

চিরকরুণ বৈধব্য ব্রতের চিরশুচিতাময়ী মূর্তি মহারাণী শরৎসুন্দরী।

১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত পুঁটিয়া গ্রামে এঁর জন্ম হয়।

পিতা ভৈরবনাথ সান্ন্যাল উপযুক্ত শিক্ষা দানে কন্যাকে যথোপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলেন। ছয় বৎসর বয়সে ১২৬২ সালে পুঁটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্দ্রনাথের সাথে শরৎসুন্দরীর বিয়ে হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ থেকে শরৎসুন্দরী যেভাবে তাঁর স্বামীকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনেন, তাতে তাঁর মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়েছিল, তাইই প্রকৃতরূপে প্রমাণিত হয়।

মাত্র তেরো বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী বিধবা হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত যেরূপ পবিত্রভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে তিনি বৈধব্যের কঠোর নিয়ম পালন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ সেবা ও পরহিত সাধনে যেরূপ অনন্যমনা ছিলেন তাতে তিনি সর্বযুগের আদর্শ স্থানীয়া নারী হ'য়ে থাকবেন এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নেই।

হিন্দু বিধবার সেবায়, দেব মন্দির প্রতিষ্ঠায় এবং পূজা পার্বনে অর্থ ব্যয়ে তিনি এমনই অকুণ্ঠ ছিলেন যে, তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে সরকার তাঁকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করেন। ১৯২০ সালে ২৫শে ফাল্গুনে এই মহিয়সী বঙ্গললনার মৃত্যু হয়। ভারতের ইতিহাসে এই মহিয়সী নারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মীরাবাঈ

রাজপুত নারী মীরাবাঈ ভাবভক্তির আদর্শ।

খুব শিশুকাল থেকেই ইনি ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিতা ছিলেন এবং হৃদয়ের ভক্তিকে বাইরে সুললিত সংগীতের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করতেন।

চিতোরের মহারাণা কুম্ভের বিবাহিত স্ত্রী হ'লেও রাজপ্রাসাদের বিলাস ও আশ্চর্য ভক্তিমতী মীরাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি।

রাজ অন্তঃপুরের ভোগ ও সুখ ত্যাগ করে নিভৃতে তিনি বনছোড়জীর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের আরাধনা করতেন ও সুমিষ্ট সঙ্গীত দ্বারা ইষ্টদেবকে তুষ্ট করতেন।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী মীরা 'আজীবন এইভাবে কাটিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসীম প্রেমের সঙ্গে স্বয়ং শ্রী গিরিধারী এঁকে দর্শন দেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রূপসনাতন এঁকে মাতৃ সম্বোধনে অভিনন্দিত করেন।

আজও ভারতের সকল প্রদেশে মীরার ভজন গীত দ্বারা প্রতি মানব হৃদয়ে ভক্তির অমিয় নির্ঝরধারা বর্ষণ করে।

রাণী দুর্গাবতী

মোগল কুলতিলক সম্রাট আকবর শাহের সময়ে যে কয়জন রাজপুত মহিলা বীরত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তার মধ্যে শালিবাহন কন্যা বীর রাণী দুর্গাবতী সর্বপ্রধানা।

গড়মণ্ডলের বীর রাজা দলপতি সিংহের সাথে এঁর বিয়ে হ'লেও অল্প বয়সে বিধবা হন। তারপর যেরূপ দক্ষতা সহকারে স্বামীর সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করেছিলেন, তার কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

মোগল সেনাপতি আসফ খাঁই রাণীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সম্রাট আকবরকে সংবাদ দেন যেন সম্রাট স্বয়ং এসে দুর্গাবতীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অশ্বপৃষ্ঠে আলুলায়িতা কুন্তলা ভারত নারীর সে রণচণ্ডী মূর্তি দেখে দিল্লীশ্বর পর্যন্ত সেদিন মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই শত্রুর বাণে রাণী দেহত্যাগ করেন। আজও প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ের আদর্শ হলেন বীর রাণী দুর্গাবতী।

লক্ষ্মীবাঈ

ভারতীয় নারীদের মধ্যে সাহসিকতা ও নির্ভীকতা এবং অস্ত্রবিদ্যায় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর স্থান সর্বোচ্চ বললে অত্যুক্তি হয় না। ইনি ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ের স্ত্রী।

অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হ'য়ে ইনি আনন্দরাম নামে একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন ডালহাউসির শাসনকাল। তাঁরই সাথে রাজ্য-সম্পর্কে রাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হলো।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ঝাঁসী অধিকার করেন। সেই সময় রাণী লক্ষ্মীবাঈ তেজঃপূর্ণ বাক্যে বলেছিলেন—মেরী ঝাঁসী দিউঙ্গী নেহি।

এই সময়ে তিনি আলুলায়িত কেশে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রেই সিংহবীর্যা এই নারী মৃত্যুমুখে পতিতা হন।

ইতিহাসে এঁর নাম চিরদিন কীর্তিতা হ'য়ে থাকবে। ইনি ভারতীয় নারীর বীরত্বের এক অপূর্ব আদর্শ।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

ভারতের বর্তমান যুগের মহিয়সী নারীদের মধ্যে একটি প্রধান চরিত্র হলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

বিজয়লক্ষ্মী ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভগ্নী আর মতিলাল নেহরুর মেয়ে।

তখন এদেশে ইংরাজ রাজত্ব।

ছেলে জওহরলাল বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এসেছে। মেয়ে বিজয়লক্ষ্মীও অত্যন্ত সুশিক্ষিতা। তিনি এম, এ পাশ। মেয়ে হয়েও ডক্টরেট পেয়েছেন।

এই পরিবার সেদিন ঐ যুগের মাঝে দাঁড়িয়ে সব সুখ বিনাসর্তে তুচ্ছ করে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজা-গোপালাচারী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে নেতাজী পর্যন্ত ভারতের বুকে যে সব ব্যক্তিত্ব বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যে সেদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তাদের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মীও একজন।

জওহরলালের পাশে থাকার জন্যে হয়ত বিজয়লক্ষ্মীর চরিত্র সাধারণের চোখে অনেক ম্লান মনে হয়। কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্বে, সংগ্রামে, সংগঠনে

তিনি যে অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তার তুলনা মেলে না।

আজও ভারতের নারী গর্ব করতে পারে যে তাদের দেশে বিজয়লক্ষ্মীর মতো একটি নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছিল।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭—সেই পবিত্র দিনে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করল। সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আর বিজয়লক্ষ্মী হলেন ভারতের মহিলা রাষ্ট্রদূত।

যখন যে দেশে তিনি কাজে থেকেছেন, সেখানেই অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের মর্মবাণী তিনি প্রচার করেছেন প্রতিটি দেশে—বিশ্ববাসী ভারতকে সম্মান করতে শিখেছে।

আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছেন। যখন যে দেশে কাজ করেছেন, তখনই তিনি সেখানে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সুদীর্ঘকাল তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন।

তারপর বিজয়লক্ষ্মীর জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়।

সারা বিশ্বের আর কোনও নারী আজ অবধি এই মর্যাদা পাননি।

বিজয়লক্ষ্মী হলেন বিশ্বের রাষ্ট্রসংঘের মহিলা সভানেত্রী। সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো এই নারীটির প্রতি সেদিন।

যে কয় বছর তিনি এই পদে ছিলেন, অপূর্ব ক্ষমতা ও গুণের পরিচয় দিয়েছেন। সারা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর মহৎ অবদানের কথা বিশ্ববাসী কোনও দিনই ভুলবে না।

ইতিমধ্যে বিশ্ব দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে রাশিয়ার দল—অন্যদিকে আমেরিকার দল। বিজয়লক্ষ্মী দুটি দলের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করে বন্ধুত্ব এনেছেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাতে না বাধে সে জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি। ভারতের ভূমিকা হলো নিরপেক্ষতার ভূমিকা। ভারত কোনও দলে যোগ দেয়নি। সে চায় বিশ্বশান্তি। বিশ্বের মানুষের ভ্রাতৃত্ব।

সে কাজ অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে করে গেছেন তিনি এই সময়ে।

বিজয়লক্ষ্মীর জীবনী ভারতীয় নারী জীবনের একটি আদর্শ চরিত্র।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি এদেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং জওহরলাল নেহেরুর মেয়ে।

সারা পৃথিবীতে একমাত্র সিংহল ছাড়া আর কোথাও মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়নি।

ইন্দিরা ছেলেবেলা থেকেই নেহরু পরিবারের আদর্শে মানুষ হন।

ছেলেবেলায় তিনি লেখাপড়া শেখেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দেন—প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর ঐ নাম।

লেখাপড়ায় মাথা ছিল খুব ভাল। প্রতিটি পরীক্ষা প্রথম সুযোগে পাশ করেন।

কিন্তু দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। স্বামীর আদর্শ তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

তাই বলে যে তিনি স্বামীকে ভালবাসতেন না, তা নয়—কিন্তু আদর্শ ছিল পৃথক।

পিতার সঙ্গে তিনি সারা বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন।

আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি যে দেশে তিনি গেছেন, উচ্চরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশেছেন। সকলেই তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন।

ভারতের বিরাট একটি সমস্যার মুহূর্তে তিনি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই গুরুভারটি বহন করে চলেছেন।

আদর্শ নারীর ব্যবহার

আদর্শ নারীর কয়েকটি ব্যবহার দেওয়া হলো।

১। স্বামীর সুখ-দুঃখের প্রতি নজর রাখা।

২। সকলের প্রতি মমতাশীল হওয়া।

৩। দেবর ভাসুরের প্রতি কর্তব্য করা।

৪। সংসারের সব কাজ দেখেশুনে নিজের হাতে করা।

৫। রুগ্নস্বামীর সেবা করা।

৬। রুগ্ন পরিজনের সেবা করা।

৭। সংসারে কলহ না করা কর্তব্য।

৮। নিষ্ঠার সঙ্গে অতিথি সেবা করা।

৯। দারিদ্র্যের মধ্যেও চরিত্র নির্মল রাখা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ না করা।

১০। নিজের সন্তানদের অপত্যস্নেহে মানুষ করা।

১১। সংসারে প্রত্যেকের হিত-উপদেশ মেনে চলা।

আর্যশাস্ত্রে ভারতীয় নারী

এবারে আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি এই সাধ্বী নারীদের সম্পর্কে কি বলেছেন তার বিষয়ে কিছু বলা হচ্ছে। সেগুলি বিশদভাবে বললেই বোঝা যাবে নারীর স্থান আর্য্য সমাজে কিরূপ ছিল।

বহ্নি পুরাণের অভিমত:—নারী সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময় প্রথমে স্বামীকে প্রণাম করবে। তারপর গৃহ পরিষ্কার করে স্নান

করবে। পরে দেবতা ব্রাহ্মণ ও পতিকে পূজা করে দেবতাকে প্রণাম করবে। তারপর রান্না করে স্বামী-পরিজনবর্গ ও অতিথি অভ্যাগতদের ভোজন করিয়ে তারপর নিজে ভোজন করবে। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী সহমরণে যাবে বা ব্রহ্মচর্য্যের মাধ্যমে বৈধব্য পালন করবে।

বিষ্ণু সংহিতার অভিমত :—নারী কখনও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরের লোকজনকে দেখবে না বা পথের দিকে চেয়ে দেখবে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া যে কোন কাজই করবে না। স্বামী বিদেশে গেলে বা তার কোন খোঁজ খবর না পেলে সে কোন আমোদ-প্রমোদ করবে না ও বেশভূষায় অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করবে না!

লক্ষ্মী পুরাণের অভিমত :—যে নারী পতিব্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রিয়বাদিনী, সভ্যভাষিণী, ব্যয়-কুণ্ঠিতা, পুত্রবতী, দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, ধর্মরতা ও দয়াপরায়না হয় তিনি সেখানেই বিরাজমান।

শঙ্খের অভিমত :—নারী জাতি কোন জায়গায় যাবার সময় বাড়ীর কোন পুরুষ অভিভাবক বা তার স্বামীর অনুমতি না নিয়ে যেতে পারবেন না। আর তারা কোন পর-পুরুষের সাথে বাক্যালাপও করবেনা।

মনুর অভিমত :—সাধ্বী স্ত্রী যে বংশে সুখে ও আনন্দে থাকে, সে বংশে তার প্রকৃত সম্মান হয় সেই বংশে শ্রীবৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। যে বংশে নারী জাতির অবমাননা হয় সেখানে শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কোন দিনও হয় না। রমণীই গৃহের শোভা ও সংসারের লক্ষ্মী। শ্রীতে ও স্ত্রীতে কোন প্রভেদ নেই।

ভারতীয় সমাজে বিবাহ

বিবাহের সময় স্বামী সুপবিত্র বেদের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নি-সাক্ষী করে বলেন :—তোমার প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সঙ্গে আমার অস্থি, তোমার মাংসের সঙ্গে আমার মাংস এবং তোমার চর্ম্মের সঙ্গে আমার চর্ম্ম মিশিয়ে নিলাম ; মনে প্রাণে ও দেহে তুমি আর আমি এক হলাম। কি পবিত্র মহান ভাব।

প্রাণৈস্তে প্রাণাম্ সন্দধানি।
অস্থিভির স্থীনি মাংসৈর্মাংসান্ ত্বচা ত্বচম্।

স্ত্রী বলেন—"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম"। হে ধ্রুব (নক্ষত্র) তুমি যেমন অচল অটল, আমিও যেন পতির কূলে তেমনি অচল অটল হয়ে থাকি।

আবার স্বামী বলেছেন—এই যে তোমার হৃদয়, তা আমার হোক। এই যে আমার হৃদয়, এটা তোমার হোক।

যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥

সত্যরূপ গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা আজ তোমার মন ও হৃদয়কে আমার মন ও হৃদয়ের সঙ্গে বন্ধন করলাম।

বধ্নামি সত্যগ্রন্থিণা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে।

"তুমি আমি এক প্রাণ, এক মন ও এক চিত্ত হলাম। আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিহিত হোক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হোক,

তুমি এক মনে আমার বাক্য পালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার করে দিন।"

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু,
মম চিত্তমনুচিত্তং তেহস্তু।
মম বাচমেকমনা জু যস্ব
প্রজাপতিস্ত্বা মিথুনক্তমহ্যম্॥

পত্নী বলেছেন—হে অরুন্ধতী! আমি তোমারই মত যেন আমার পতিতে কায়মনোবাক্যে অবরুদ্ধা হয়ে থাকতে পারি।

হিন্দু শাস্ত্রের বিবাহধর্ম কিরূপ পবিত্র ধর্মমূলক ও মর্মস্পর্শী তা ওপরে লেখা বিবাহ মন্ত্র থেকেই বুঝতে পারা যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিবাহ মন্ত্র এই রকম উচ্চভাবপূর্ণ নয়।

কয়েকটি মহাজন বাক্য

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

—রবীন্দ্রনাথ

নারীর কাজও সেবা, যে নারী তা সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে, সেই নারীই নারীত্বের আদর্শে গৌরবান্বিতা। যে তা পারে না, শত শিক্ষা দীক্ষা থাকিলেও তাহার কোনও মূল্য নাই।

—শ্রীশ্রীমা

যে পবিত্র গুণরাজির জন্যে ভারতীয় নারীর কথা চিন্তা করলেই আমার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে, তা হলো ভারতীয় নারীর ত্যাগ, ক্ষমা, মমতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলী। ভারতীয় নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজির একটি সমন্বয়, এই ধারণাই আজ সারা পাশ্চাত্য জগতের।

—রোমাঁ রোলাঁ

নারী বিলাসের পণ্য নয়, নারী ভোগ্যা নয়। ওরে এরা যে মা। মা-ই ত সন্তানকে জাগিয়ে তুলবে, মানুষ করে তুলবে। নারীই ত জাতিকে গঠন করবে। তাই ওরা চিরপূজ্যা।

ভারতের নারী সমাজ তথা মাতৃজাতিই যে আমাদের সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আমাদের উন্নতির মূলে যে তাহারাই, একথা যে অস্বিকার করে সে মূর্খ আজও আমরা যে প্রাচীন সংস্কারকে ভুলিতে পারি নাই, তার মূলে আছে ভারতের নারীজাতি।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়